তফসীরে

মা'আরেফুল-কোরআন

সপ্তম খণ্ড

[সূরা লোকমান, সূরা সাজদাহ, সূরা আহযাব, সূরা সাবা, সূরা ফাতির, সূরা ইয়া-সীন, সূরা সাফফাত, সূরা ছোয়াদ, সূরা যুমার, সূরা মু'মিন, সূরা হা-মীম সিজদাহ, সূরা শূরা, সূরা যুখরুফ, সূরা দুখান, সূরা জাসিয়া, সূরা আহকাফ]

মূল

হযরত মাওলানা

মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র)

অনুবাদ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংস্করণে

অনুবাদকের আরয

بسم الله الرحمن الرحيم

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন এ যুগের কোরআন চর্চাকারীগণের জন্য একটি নিয়ামত বিশেষ। উর্দু ভাষায় রচিত এ অনুপম তফসীরগ্রন্থটি ইতিমধ্যেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে পবিত্র কোরআনের রস-আস্বাদন পিপাসু বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণে সহায়তা করেছে।

এ মহত্তম তফসীর গ্রন্থটি যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলিম হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-র অসাধারণ কীর্তি। এতে পাক কোরআনের মূল ব্যাখ্যাতা খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তফসীর সম্পর্কিত বাণীগুলোর উদ্ধৃতি, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন এবং পরবর্তী প্রাজ্ঞ মনীষীগণের ব্যাখ্যা ও বর্ণনার সাথে সাথে আধুনিক জিজ্ঞাসাদির কোরআন-ভিত্তিক জবাবও যুক্তিপূর্ণভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। ফলে এ অনন্য তফসীরগ্রন্থখানির উপযোগিতা বহুলাংশে বর্ধিত হয়েছে। একই কারণে বাংলা ভাষায় তফসীরে মা'আরেফুল কোরআনের অনুবাদ একটি স্মরণীয় ঘটনারূপে অনেক বিজ্ঞ পাঠক মন্তব্য করেছেন।

আট খণ্ডে সমাপ্ত এই বিরাট গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে এ দেশের পাঠক সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই এর দ্বিতীয় সংস্করণ এমনকি প্রথম দিককার খণ্ডগুলির তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশ করতে হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থটি উক্ত মহাগ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। সর্বশেষ খণ্ডটিরও প্রথম সংস্করণ বহু আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই থেকেই মা'আরেফুল কোরআনের কবুলিয়ত ও জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

মেহেরবান আল্লাহ তুচ্ছ বস্তুকে মুহূর্তের মধ্যে মহামূল্যবান করে দিতে পারেন। তেমনি অতি সাধারণ অযোগ্য কোন লোক দ্বারাও বড় কাজ করিয়ে নিতে পারেন। তফসীরে মা'রেফুল কোরআনের ন্যায় মহাগ্রন্থের অনুবাদ কর্মও অত্যন্ত বড় একটি কাজ বলে আমি মনে করি। আর আমার মতো একটি অসহায় বান্দাকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে নেওয়া তাঁর একটি অসাধারণ অনুগ্রহ বলেই আমি বিবেচনা করি। অবনত মস্তকে শুকুর আদায় করি তাঁর এই অনুপম অনুগ্রহের প্রতি।

সপ্তম খণ্ডের প্রথম সংস্করণে যে সামান্য কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, সেগুলোর প্রতি বেশ কয়েকজন সহৃদয় পাঠক পত্র মারফত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্তমান সংস্করণে সে সব ত্রুটি সংশোধন করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের সে ঋণ স্বীকার করে দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন তাঁদের এ সহৃদয়তাটুকুর যোগ্য প্রতিফলন দান করেন।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মা'আরেফুল কোরআন অনুবাদের পরিকল্পনা ও তা দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পূর্ববর্তী দু'জন মহাপরিচালক যথাক্রমে জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম ও জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া ও সচিব জনাব মোঃ সাদেকুদ্দিন এবং প্রকাশনা পরিচালক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুরের নিষ্ঠা ও আগ্রহ ছিল অসাধারণ। পরবর্তী সংস্করণগুলি দ্রুত প্রকাশের ক্ষেত্রে বর্তমান মহাপরিচালক জনাব এম. সোবহান, সচিব জনাব ফিরোজ আহমদ আখতার, প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর ও উপ-পরিচালক জনাব লুতুফুল হকের নিষ্ঠাপূর্ণ আগ্রহ স্মরণ করার মত। এ খণ্ডটির অনুবাদের কপি প্রস্তুত, অনূদিত কপি নিরীক্ষা ও মুদ্রণ কর্মে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন যথাক্রমে জনাব মাওলানা আবদুল আজীজ, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব ও ঢাকা আলীয়া মাদরাসার তদানীন্তন হেড মাওলানা জনাব মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী। এঁদের সবার প্রতিই আমি ঋণী।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবাইকে স্ব স্ব শ্রমের যোগ্য পুরস্কার দান করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

সহৃদয় পাঠকদের দোআ প্রার্থনা করি, যেন মহান আল্লাহ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এ সর্ববৃহৎ তফসীর গ্রন্থটির অবশিষ্ট সব কয়টি খণ্ডের সংশোধিত পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করার তওফীক দান করেন। আমীন!!

বিনয়াবনত

মুহিউদ্দীন খান

তাঃ ২রা যিলকদ

১৪০৭ হিঃ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা লোকমান	১
অশ্লীল নভেল–নাটক ও অন্যান্য পুস্তক পাঠ	৬
খেলার সাজ–সরঞ্জাম ক্রয়–বিক্রয়ের বিধান	৭
অনুমোদিত ও বৈধ খেলা	৭
গান ও বাদ্যযন্ত্র	৮
হযরত লোকমান নবী ছিলেন কিনা	১৭
হযরত লোকমানের হিকমত কি	১৯
পিতামাতার আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে	২০
লোকমানের উপদেশ	২১
অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত মাসআলা	৩৮
ইলমে গায়েব সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	৪০
সূরা সাজদাহ	৪৩
কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য	৪৭
দুনিয়ার সকল বস্তুই মূলত উত্তম ও কল্যাণকর	৪৮
আত্মবিয়োগ ও মালাকুল মউত সম্পর্কে	৫৪
তাহাজ্জুদের নামায	৫৬
আল্লাহর দিকে যারা ফিরে আসে তাদের জন্য ইহলৌকিক বিপদাপদ রহমতস্বরূপ	৫৭
কতক পাপের শাস্তি ইহকালেই হয়ে যায়	৫৮
কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিচালক ও নেতা হওয়ার দু'টি শর্ত	৬১
সূরা আহযাব	৬৪
শানে নুযুল	৬৫
আহযাবের যুদ্ধের বিবরণ	৮৮
রাজনীতিক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নতুন ব্যাপার নয়	৯০
মুসলমানের যুদ্ধ প্রস্তুতি	৯১
পরিখা খনন	৯১
যাবতীয় বিপদাপদ উত্তীর্ণ হওয়ার অমোঘ বিধান	৯৫
রসূলুল্লাহর এটি যুদ্ধ কৌশল	৯৮
প্রণিধানযোগ্য বিষয়	১০৫
অনুগ্রহের প্রতিদান	১০৮
নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীদের একটি বৈশিষ্ট্য	১১৮
পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ হিদায়েত	১২১
কোরআনের ন্যায় হাদীসের সংরক্ষণ	১৩৪
কোরআন পাকে পুরুষদের সংবোধন করার তাৎপর্য	১৩৬
বিয়ে–শাদীতে বংশগত সমতা রক্ষার নির্দেশ এবং তার স্তর	১৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
সমতার মাস'আলা	১৪৪
অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা বাঞ্ছনীয়	১৪৮
খতমে নবুয়তের মাস'আলা	১৫৭
রসূলুল্লাহ (সা)–র বিশেষ গুণাবলী	১৭০
ইসলামে সদাচারের নযীরবিহীন শিক্ষা	১৭৫
বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত হুকুম	১৮০
রসূলুল্লাহ (সা)–এর সংসারবিমুখ জীবন ও বহু বিবাহ	১৮৭
পর্দার বিধান	১৯৪
পর্দার বিধানাবলী, অশ্লীলতা দমনে ইসলামী ব্যবস্থা	১৯৮
অপরাধ দমনে ইসলামের নীতি	১৯৯
গুপ্তাংগ আবৃত করার বিধান ও পর্দার মধ্যে পার্থক্য	২০৪
শরীয়তসম্মত পর্দার স্তর ও বিধানাবলীর বিবরণ	২০৬
সালাত ও সালামের অর্থ	২১৩
দরূদ ও সালামের পদ্ধতি	২১৪
রসূলুল্লাহ (সা)–কে কোন প্রকারে কষ্ট দেয়া কুফরী	২২০
কোন মুসলমানকে শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেওয়া হারাম	২২০
মুসলমান হওয়ার পর ধর্মত্যাগের শাস্তি হত্যা	২২৫
আমানতের উদ্দেশ্য কি	২৩৪
সূরা সাবা	২৪১
শিল্প ও কারিগরির ফযীলত	২৫২
জিন অধীন করা কিরূপ?	২৫৬
ইসলামে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ	২৫৯
সোলায়মান (আ)–এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা	২৬৩
পার্থিব ধন–সম্পদ ও সম্মানকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার দলীল মনে করা ধোঁকা	২৮৭
মক্কার কাফিরদের প্রতি দাওয়াত	২৯১
সূরা ফাতির	৩০৪
উম্মতে মুহাম্মদী বিশেষত আলিমগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য	৩৩৩
উম্মতে মুহাম্মদী তিন প্রকার	৩৩৪
সূরা ইয়াসীন	৩৪৭
সূরা ইয়াসীনের ফযীলত	৩৪৯
শহরের প্রান্ত থেকে আগন্তুক ব্যক্তির ঘটনা	৩৬১
মানুষের খাদ্য ও জীবজন্তুর খাদ্যের পার্থক্য	৩৭০
আরশের নীচে সূর্যের সিজদা	৩৭৩
চন্দ্রের মনযিল	৩৭৯
কোরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখ	৩৮০
মালিকানার মূল কারণ আল্লাহ্‌র দান, পুঁজি ও শ্রম নয়	৩৯৬
সূরা সাফফাত	৪০১
নামাযে সারিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব	৪০৪
এক জান্নাতী ও তার কাফির সঙ্গী	৪২৫
মৃত্যুর বিলুপ্তিতে বিস্ময় প্রকাশ	৪২৬
জ্যোতির্বিদ্যার শরীয়তগত মর্যাদা	৪৩৭
পুত্র কোরবানীর ঘটনা	৪৪৪
কোরবানী ইসমাঈল (আ) হয়েছিলেন, না ইসহাক (আ)	৪৪৯
হযরত ইলিয়াস জীবিত আছেন কি?	৪৫৯
আল্লাহ্‌ওয়ালাদের বিজয়ের মর্ম	৪৭৪
সূরা ছোয়াদ	৪৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
চাশতের নামায	৪৮৫
স্বাভাবিক ভীতি নবুয়ত ও ওলীদের পরিপন্থী নয়	৪৯২
চাপ প্রয়োগ চাঁদা বা দান-খয়রাত চাওয়া লুণ্ঠনের নামান্তর	৪৯৩
ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল কর্তব্য	৪৯৭
বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক	৪৯৭
দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য সর্ব প্রথম দেখার বিষয় চরিত্র	৪৯৮
রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া	৫০৮
হযরত আইয়্যুব (আ)-এর রোগ কি ছিল	৫১০
শরীয়তের দৃষ্টিতে কৌশল	৫১১
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের মিল থাকা উত্তম	৫১৬
সূরা যুমার	৫২২
তৎকালীন মুশরিকরাও বর্তমান কাফিরদের চেয়ে উত্তম ছিল	৫২৬
চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই গতিশীল	৫২৭
হাশরের আদালতে মযলুমের হক কিরূপে আদায় করা হবে	৫৪৭
সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে পথনির্দেশ	৫৫৭
সূরা মু'মিন	৫৬৯
সূরার বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত	৫৭১
বিপদাপদ থেকে হিফাযত	৫৭২
ফেরাউন বংশীয় মু'মিন	৫৯১
দোয়া কবূলের শর্ত	৬০৪
সূরা হা-মীম সিজদাহ্	৬১৫
রসূলুল্লাহ্র সামনে কাফিরদের একটি প্রস্তাব	৬১৮
কাফিরদের অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পয়গাম্বরসুলভ জওয়াব	৬২১
আকাশ ও পৃথিবী কোনটির পর কোনটি এবং কোন কোন দিনে সৃজিত	৬২৫
হাশরের মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদান	৬৩৬
নীরবতার সাথে কোরআন শ্রবণ করা ওয়াজিব	৬৩৮
আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা জায়েয নয়	৬৪৫
কুফরের বিশেষ প্রকার 'এলহাদ' এর সংজ্ঞা ও বিধান	৬৪৯
একটি বিভ্রান্তির অবসান	৬৫০
বর্তমান যুগে কুফর ও এলহাদের ব্যাপকতা	৬৫১
সূরা শূরা	৬৬০
পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে নুযুল	৬৮৬
দুনিয়াতে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য বিপর্যয়ের কারণ	৬৮৭
জান্নাত ও দুনিয়ার পার্থক্য	৬৮৮
পরামর্শের গুরুত্ব ও পন্থা	৬৯৪
সূরা যুখরুফ	৭০৪
প্রচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বসে থাকা উচিত নয়	৭০৬
জীবিকা বন্টনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা	৭১৮
সামাজিক সাম্যের তাৎপর্য	৭১৯
ইসলামী সাম্যের অর্থ	৭২২
আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখতা কুসংসর্গের কারণ	৭২৭
প্রকৃত বন্ধুত্ব তা-ই, যা আল্লাহ্র	

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওয়াস্তে হয়	৭৪০
সূরা দুখান	৭৪৬
সূরার ফযীলত	৭৪৭
আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন	৭৫৯
তুব্বার সম্প্রদায়ের ঘটনা	৭৬২
সূরা জাসিয়া	৭৬৬
পূর্ববর্তী উম্মতদের শরীয়তের বিধান আমাদের জন্য	৭৭৫
দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলা ঠিক নয়	৭৮০
সূরা আহকাফ	৭৮৫
রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত আদব	৭৯১
মাতার হক পিতা অপেক্ষা বেশি	৭৯৯
গর্ভ ধারণের ও স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কালের ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মতভেদ	৮০০
দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা	৮০৪

سورة لقمان مكية

সূরা লোকমান

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪ রুকূ, ৩৪ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣﴾
الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ
يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۭ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٦﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ
لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٧﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) এগুলো প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত। (৩) হিদায়ত ও রহমত সৎকর্মপরায়ণদের জন্য। (৪) যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখিরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এসব লোকই তাদের পরওয়ারদিগারের তরফ থেকে আগত হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই সফলকাম। (৬) এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর

কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (৭) যখন ওদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন ওরা দম্ভের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা তা শুনতেই পায়নি অথবা যেন ওদের দু'কান বধির। সুতরাং ওদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। (৮) যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামত ভরা জান্নাত। (৯) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা যথার্থ। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলীফ-লাম-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। এ সূরায় অথবা কোরআনে উল্লিখিত)। এগুলো এক প্রজ্ঞাময় কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) আয়াত যা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য হিদায়ত ও রহমতের কারণ, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (অতএব) তারাই (কোরআনের বিশ্বাস ও কর্মের বদৌলতে) তাদের পালনকর্তার তরফ থেকে আগত সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম। (সুতরাং কোরআন এভাবে তাদের জন্য হিদায়ত ও রহমতের কারণ হয়ে গেছে, যার ফলে তারা সফলকাম হয়েছে। এ হচ্ছে কতক লোকের অবস্থা। পক্ষান্তরে) এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা (কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে) এমন বিষয় ক্রয় করে (অর্থাৎ অবলম্বন করে,) যা (আল্লাহ্‌ থেকে) গাফিল করে দেয়, (অতএব প্রথমত ক্রীড়া-কৌতুক অবলম্বন করা, তৎসহ আল্লাহ্‌র আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া স্বয়ং কুফর ও পথভ্রষ্টতা; বিশেষত তা যদি এই উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হয়,) যাতে (এর মাধ্যমে অন্য লোকদেরকেও) আল্লাহ্‌র পথ (অর্থাৎ সত্য ধর্ম থেকে) অন্ধভাবে পথভ্রষ্ট করে এবং (পথভ্রষ্ট করার সাথে) এর (অর্থাৎ সত্য-ধর্মের) প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে (যাতে মানুষের মন এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায় তবে তো এটা কুফরই কুফর এবং পথভ্রষ্টতাই পথভ্রষ্টতা)। এদের (অর্থাৎ এরূপ লোকদের) জন্য (পরকালে) রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি, (যেমন তাদের বিপরীত লোকদের জন্য সফলতা রয়েছে বলে জানা গেছে। উপরোক্ত ব্যক্তি এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যে,) যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে দম্ভভরে (এমন আনমনা হয়ে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনেইনি, তার কানে যেন ছিপি লাগানো আছে (অর্থাৎ সে যেন বধির)। সুতরাং তাকে এক যন্ত্রণা-দায়ক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন। (যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এ হচ্ছে তার শাস্তির বর্ণনা। অতপর যারা হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের প্রতিদান বর্ণিত হচ্ছে। এ প্রতিদান প্রতিশ্রুত সফলতারও ব্যাখ্যা)। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ-কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে ভোগ-বিলাসের জান্নাত। সেথায় তারা চিরকাল থাকবে। এটা আল্লাহ্‌র সাচ্চা ওয়াদা। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সুতরাং পরাক্রমশালী

হওয়ার কারণে ওয়াদা ও শাস্তিবাণী বাস্তবায়িত করতে পারেন এবং প্রজ্ঞাময় হওয়ার কারণে তা ওয়াদা অনুযায়ী বাস্তবায়িত করবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ—মক্কায় অবতীর্ণ এ আয়াতে যাকাতের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, মূল যাকাতের আদেশ হিজরতের পূর্বে মক্কা মোয়াযযমাতেই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হিজরতের দ্বিতীয় সনে যাকাতের বিধান কার্যকর হয় বলে যে খ্যাতি আছে, এর অর্থ এই যে, যাকাতের নিসাব নির্ধারণ, পরিমাণের বিবরণ এবং ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা আদায় করা ও যথার্থ খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থাপনা হিজরী দ্বিতীয় সনে সম্পন্ন হয়েছে।

সূরা মুযাম্মিলের اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ—আয়াতের অধীনে ইবনে কাসীর এ বক্তব্যই সপ্রমাণ করেছেন। কেননা সূরা মুযাম্মিল কোরআন অবতরণের প্রাথমিককালে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এ থেকে জানা যায় যে, কোরআন পাকের আয়াতসমূহে যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামায ও যাকাত একত্রে উল্লিখিত হয়েছে, তেমনি এগুলো ফরযও সাথে সাথেই হয়েছে।

اشْتَرٰى لَهْوَ الْحَدِيْثِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ শব্দের আভিধানিক অর্থ ক্রয় করা। কোন কোন সময় এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করার অর্থেও اشتراء শব্দ ব্যবহৃত হয়। اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ইত্যাদি আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস বাণিজ্য ব্যপদেশে বিভিন্ন দেশে সফর করত। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কিসরা প্রমুখ আজমী সম্রাটের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই ক্রয় করে আনল এবং মক্কার মুশরিকদেরকে বলল, মুহাম্মদ তোমাদেরকে আদ, সামূদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কিস্‌সা-কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইসফেন্দিয়ার প্রমুখ পারস্য সম্রাটের সেরা কাহিনী শুনাই। মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহভরে তার আনীত কাহিনী শুনতে থাকে। কারণ এগুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু ছিল না, যা পালন করার শ্রম স্বীকার করতে হয়; বরং এগুলো ছিল চটকদার গল্প-গুচ্ছ। এর ফলে অনেক মুশরিক, যারা এর আগে কোরআনের অলৌকিকতা ও অদ্বিতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ রাখত এবং গোপনে শুনতও, তারাও কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ছুঁতা পেয়ে গেল।—(রূহুল মা'আনী)

দুররে মনসূরে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করে এনে তাকে কোরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে ফিরানোর কাজে নিয়োজিত করলো। কেউ কোরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনাবার জন্য সে বাঁদীকে আদেশ করত ও বলত, মুহাম্মদ তোমাদেরকে কোরআন শুনিয়ে নামায পড়া, রোযা রাখা এবং ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। এতে কষ্টই কষ্ট। এস এ গানটি শোন এবং উল্লাস কর।

আলোচ্য আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে; এতে لَهْوَ الْحَدِيْث ক্রয় করার অর্থ আজমী সম্রাটগণের কিস্‌সা কাহিনী অথবা গায়িকা বাঁদী ক্রয় করা। শানে-নুযূলের প্রতি লক্ষ্য করলে আয়াতে اشتراء শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ ক্রয় করা।

পরে বর্ণিত لهو الحديث-এর ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে اشتراء শব্দটিরও এ স্থলে ব্যাপক অর্থ হবে অর্থাৎ এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করা। ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণ ক্রয় করাও এতে দাখিল।

لَهْوَ الْحَدِيْث বাক্যটিতে حديث শব্দের অর্থ কথা, কিসসা-কাহিনী এবং لهو শব্দের অর্থ গাফিল হওয়া। যেসব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফিল করে দেয়, সেগুলোকে لهو বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও لهو বলা হয়, যার কোন উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরঞ্জনের জন্য করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْث--এর অর্থ ও তফসীর কি, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও জাবের (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে এর তফসীর করা হয়েছে গানবাদ্য করা। ---(হাকেম, বায়হাকী)

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিস্‌সা কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও স্মরণ থেকে গাফিল করে সেগুলো সবই لَهْوَ الْحَدِيْث—বুখারী ও বায়হাকী স্ব-স্ব কিতাবে لَهْوَ الْحَدِيْث

এর এ তফসীরই অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন: لَهْوَ الْحَدِيْث هُوَ الْغِنَاءُ

لهو الحديث অর্থাৎ واشباهه বলে গান ও তদনুরূপ অন্যান্য বিষয় বোঝানো হয়েছে (যা আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে গাফেল করে দেয়)। বায়হাকীতে আছে : لهو الحديث ক্রয় করার অর্থ গায়ক পুরুষ অথবা গায়িকা নারী ক্রয় করা কিংবা তদনুরূপ এমন অনর্থক বস্তু ক্রয় করা যা মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়, ইবনে জারীরও এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করেছেন। (রূহুল-মা'আনী) তিরমিযীর এক রেওয়ায়েত থেকেও এরূপ ব্যাপক অর্থ প্রমাণিত হয়। এতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, গায়িকা বাঁদীদের ব্যবসা করো না। অতপর তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যবসা সম্পর্কেই وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِىْ আয়াত নাযিল হয়েছে।

ক্রীড়া-কৌতুক ও তার সাজ-সরঞ্জামাদি সম্পর্কে শরীয়তের বিধান : প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক কেবল নিন্দার স্থলেই ক্রীড়া ও খেলাধুলার উল্লেখ করেছে। এই নিন্দার সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে মাকরূহ হওয়া। (রূহুল মা'আনী, কাশশাফ) আলোচ্য আয়াতটি ক্রীড়া-কৌতুকের নিন্দায় সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

মুস্তাদরাক হাকেমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন :

كل شيئ من لهو الدنيا باطل الا ثلثة انتضالك بقوسك وتاديبك لفرسك وملاعبتك لاهلك فانهن من الحق -

অর্থাৎ পার্থিব সকল খেলাধুলা বাতিল; কিন্তু তিনটি বাতিল নয়; (১) তীরধনুক নিয়ে খেলা, (২) অশ্বকে প্রশিক্ষণ দানের খেলা এবং (৩) নিজের স্ত্রীর সাথে হাস্যরসের খেলা। এ তিন প্রকার খেলা বৈধ।

এ হাদীসে প্রত্যেক খেলাকে বাতিল সাব্যস্ত করে যে তিনটি বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়। কেননা, খেলা এমন কাজকে বলা হয়, যাতে কোন উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই। উপরোক্ত তিনটি বিষয়ই উপকারী কাজ। এগুলোর সাথে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা জড়িত আছে। তীর নিক্ষেপ ও অশ্বকে প্রশিক্ষণ দেওয়া তো জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস সন্তান প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যকে পূর্ণতা দান করে। এগুলোকে কেবল দৃশ্যত ও বাহ্যিক দিক দিয়ে খেলা বলে দেওয়া হয়েছে; নতুবা প্রকৃতপক্ষে এগুলো খেলাই নয়। অনুরূপভাবে এই তিনটি বিষয় ছাড়া আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলোর সাথে ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা সম্পৃক্ত রয়েছে এবং কেবল দৃশ্যত সেগুলোকে খেলা মনে করা হয়। অন্যান্য হাদীসে সেগুলোকেও

বৈধ বরং কতককে উত্তম কাজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

সারকথা এই যে, যেসব কাজ প্রকৃতপক্ষে খেলা অর্থাৎ যাতে কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেগুলো সব অবশ্যই নিন্দনীয় ও মাকরূহ। তবে কতক একেবারে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কতক প্রকাশ্য হারাম এবং কতক কমপক্ষে মাকরূহ তানযিহী অর্থাৎ অনুত্তম। যেসব কাজ প্রকৃতই খেলা, তার কোনটিই এ বিধানের বাইরে নয়। হাদীসে যেসব খেলাকে ব্যতিক্রমভুক্ত প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো আসলে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হযরত ওকবা ইবনে আমেরের হাদীসে একথা পরিষ্কার ব্যক্তও করা হয়েছে। হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ

ليس من اللهو ثلاث تاديب الرجل فرسه وملاعبة اهله ورميه بقوسه ونبله ـ .

এ হাদীস পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, ব্যতিক্রমভুক্ত তিনটি বিষয় প্রকৃতপক্ষে খেলাই নয় এবং যা প্রকৃতপক্ষে খেলা, তা বাতিল ও নিন্দনীয়। অতপর খেলার নিন্দনীয় হওয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে ঃ

(১) যে খেলা দীন থেকে পথভ্রষ্ট হওয়ার অথবা অপরকে পথভ্রষ্ট করার উপায় হয়, তা কুফর, যেমন আলোচ্য وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ আয়াতে এর কুফর ও পথভ্রষ্টতা হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং এর শাস্তি অবমাননাকর আযাব উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাফিরদের শাস্তি। কারণ, আয়াতটি নযর ইবনে হারেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সে এই খেলাকে ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কাজে ব্যবহার করেছিল। তাই এ খেলা হারাম তো বটেই, কুফর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

(২) যে খেলা মানুষকে ইসলামী বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নেয় না; কিন্তু কোন হারাম কাজে ও গোনাহে লিপ্ত করে দেয়, এরূপ খেলা কুফর নয়; কিন্তু হারাম ও কঠোর গোনাহ্ যেমন জুয়ার ভিত্তিতে হারজিতের সকল প্রকার খেলা অথবা যে খেলা নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয কর্মে অন্তরায় হয়।

অশ্লীল ও বাজে নভেল, অশ্লীল কবিতা এবং বাতিল পন্থীদের পুস্তক পাঠ করাও নাজায়েয ঃ বর্তমান যুগে অধিকাংশ যুবক অশ্লীল নভেল, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত। এসব বিষয় উপরোক্ত হারাম খেলার অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে পথভ্রষ্ট বাতিল পন্থীদের চিন্তাধারা অধ্যয়ন করাও সর্ব সাধারণের জন্য পথভ্রষ্টতার কারণ বিধায় নাজায়েয। তবে গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলিমগণ জওয়াব দানের উদ্দেশ্যে এগুলো পাঠ করলে তাতে আপত্তি নেই।

(৩) যে সব খেলায় কুফর নেই কোন প্রকার গোনাহ্ নেই, সেগুলো মাকরূহ। কারণ, এতে অনর্থক কাজে আপন শক্তি ও সময় বিনষ্ট করা হয়।

খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান ঃ উপরোক্ত বিবরণ থেকে খেলার সাজসরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানও জানা গেছে যে, যেসব সাজসরঞ্জাম কুফর অথবা হারাম খেলায় ব্যবহৃত হয় সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম এবং যেগুলো মাকরূহ খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ব্যবসা করাও মাকরূহ। পক্ষান্তরে যেসব সাজসরঞ্জাম বৈধ ও ব্যতিক্রমভুক্ত খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ এবং যেগুলো বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় ব্যবহার করা হয়; সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ।

অনুমোদিত ও বৈধ খেলা ঃ পূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে যে, যে খেলায় কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেই খেলাই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অথবা অন্য কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা লাভের জন্য অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য খেলা হয়, সেই খেলা শরীয়ত অনুমোদন করে যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিঘ্নিত না হয়। আর ধর্মীয় প্রয়োজনের নিয়তে খেলা হলে তাতে সওয়াবও আছে।

উপরে বর্ণিত হাদীসে তিনটি খেলাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে---তীর নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস করা। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ خير لهو المومن السباحة وخير لهو المرأة المغزل অর্থাৎ মু'মিনের শ্রেষ্ঠ খেলা সাঁতার কাটা এবং নারীর শ্রেষ্ঠ খেলা সুতা কাটা।

সহীহ্ মুসলিম ও মনসদে আহমদে হযরত সালমা ইবনে আকওয়া বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী দৌড়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। প্রতিযোগিতায় কেউ তাকে হারাতে পারত না। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত আছে কি? আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। অতপর প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়ে গেলাম। এ থেকে জানা গেল যে, দৌড় অনুশীলন করাও বৈধ।

খ্যাতনামা কুস্তিগীর রোকানা একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে কুস্তিতে অবতীর্ণ হলে তিনি তাকে ধরাশায়ী করে দেন।----(আবূ দাউদ)

আবিসিনিয়ার কতিপয় যুবক মদীনা তাইয়্যেবায় সামরিক কলাকৌশল অনুশীলন-কল্পে বর্শা ইত্যাদি নিয়ে খেলায় প্রবৃত্ত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে নিজের পশ্চাতে দাঁড় করিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ لهوا و العبوا ! অর্থাৎ খেলাধুলা অব্যাহত রাখ। (বায়হাকী, কান্য)

কতক রেওয়ায়েতে আরও আছে ঃ فانى اكره ان يرى فى دينكم غلظة অর্থাৎ তোমাদের ধর্মে শুষ্কতা ও কঠোরতা পরিলক্ষিত হোক---এটা আমি পছন্দ করি না।

অনুরূপভাবে কতক সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁরা কোরআন ও হাদীস সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ততার ফলে অবসন্ন হয়ে পড়তেন, তখন অবসাদ দূর করার জন্য মাঝে মাঝে আরবের প্রচলিত কবিতা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা মনোরঞ্জন করতেন।

এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ روحوا القلوب ساعة فساعة অর্থাৎ তোমরা মাঝে মাঝে অন্তরকে বিশ্রাম ও আরাম দেবে।---(আবূ দাউদ) এ থেকে অন্তর ও মস্তিষ্কের বিনোদন এবং এর জন্য কিছু সময় বের করার বৈধতা প্রমাণিত হল।

এসব বিষয়ের শর্ত এই যে, এসব খেলার অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ লক্ষ্য অর্জনের নিয়তেই খেলায় প্রবৃত্ত হতে হবে। খেলার জন্য খেলা উদ্দেশ্য না হওয়া চাই, প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করা এবং বাড়াবাড়ি না করা চাই। এসব খেলা বৈধ হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সীমার ভিতর থাকলে এগুলো لهو তথা নিষিদ্ধ ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে দাখিল নয়।

কতক খেলা, যেগুলো পরিষ্কার নিষিদ্ধ ঃ এমনও কতক খেলা রয়েছে যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা) বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যদিও সেগুলোতে কিছু কিছু উপকারিতা আছে বলেও উল্লেখ করা হয়। যেমন দাবা, চওসর ইত্যাদি। এগুলোর সাথে হারজিত ও টাকা-পয়সার লেন-দেন জড়িত থাকলে এগুলো জুয়া ও অকাট্য হারাম। অন্যথায় কেবল চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে খেলা হলেও হাদীসে এসব খেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, যে ব্যক্তি চওসর খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার হাতকে শূকরের রক্তে রঞ্জিত করে। অনুরূপভাবে এক হাদীসে দাবা খেলোয়াড়ের প্রতি অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে।----(নসবুররায়াহ)

এমনিভাবে কবুতর নিয়ে খেলা করাকে রসূলুল্লাহ্ (স) অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। (আবূ দাউদ, কান্য) এই নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক কারণ এই যে, সাধারণভাবে এ সব খেলায় মগ্ন হলে মানুষ জরুরী কাজকর্ম এমনকি নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত থেকেও অসাবধান হয়ে যায়।

গান ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত বিধান ঃ কয়েকজন সাহাবী উল্লিখিত আয়াতে لهو الحديث এর তফসীর করেছেন গান-বাজনা করা। অন্য সাহাবীগণ ব্যাপক তফসীর করে বলেছেন যে, আয়াতে এমন প্রত্যেক খেলা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে দেয়। তাঁদের মতেও গান-বাজনা এতে দাখিল আছে।

কোরআন পাকের لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ আয়াতে ইমাম আবূ হানীফা. মুজাহিদ মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া প্রমুখ আলিম زور শব্দের তফসীর করেছেন গান-বাজনা।

আবূ দাউদ, ইবনে মাজা ও ইবনে-হিব্বান বর্ণিত হযরত আবূ মালেক আশ-'আরীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

ليشربن ناس من امتى الخمر ويسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل الله منهم القردة والخنازير-

আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আকৃতি বিকৃত করে বানর ও শূকরে পরিণত করে দেবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মদ, জুয়া, তবলা ও সারেঙ্গী হারাম করেছেন। তিনি আরও বলেন, নেশা-গ্রস্ত করে—এমন প্রত্যেক বস্তু হারাম। —(আহমদ, আবূ দাউদ)

روى عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتخذ الفى دولا والامانة مغنما والزكوة مغرما وتعلم لغير الدين واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات فى المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور ولعن اخر هذه الامة اولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وايات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضا-

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যখন জিহাদলব্ধ সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা হবে, যখন গচ্ছিত বস্তুকে লুটের মাল গণ্য করা হবে, যাকাতকে জরিমানার মত কঠিন মনে করা হবে, যখন পার্থিব সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করা হবে, যখন মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য ও মাতার অবাধ্যতা শুরু করবে, যখন বন্ধুকে নিকটে টেনে নেবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, যখন মসজিদসমূহে হট্টগোল হবে, যখন পাপাচারী কুকর্মী ব্যক্তি

গোত্রের নেতা হবে, যখন নীচতম ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের প্রধান হবে, যখন দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে তাদের অনিষ্টের ভয়ে, যখন গায়িকা নারী ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হবে, যখন মদ্যপান শুরু হবে, যখন মুসলিম সম্প্রদায়ের পরবর্তী লোকগণ পূর্ববর্তীগণকে অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা প্রতীক্ষা কর একটি লালবর্ণযুক্ত বায়ুর, ভূমিকম্পের, ভূমি ধসের, আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার এবং কিয়ামতের এমন নিদর্শনসমূহের, যেগুলো একের পর এক প্রকাশমান হতে থাকবে, যেমন কোন মালার সূতা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একের পর এক খসে পড়তে থাকে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীসের শব্দগুলো বারবার পড়ুন এবং দেখুন, এ যেন বর্তমান জগতের পরিপূর্ণ চিত্র। যেসব গোনাহ্ বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে, চৌদ্দশ বছর পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সা) তার সংবাদ দিয়ে গেছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরদার থাকার জন্য এবং পাপকর্ম থেকে নিজে বাঁচার ও অপরকে বাঁচানোর সযত্ন প্রয়াস অব্যাহত রাখার জন্য তিনি মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন।

অন্যথায় যখন এসব পাপ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তখন এ ধরনের পাপীদের উপর আসমানী আযাব নাযিল হবে এবং কিয়ামতের সর্বশেষ লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে যাবে। মেয়েদের নৃত্যগীত এবং সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রসমূহ যথা ঃ তবলা, সারিন্দা ইত্যাদিও এ পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এখানে এ হাদীসটি এই প্রেক্ষাপটেই নকল করা হয়েছে।

এতদ্ভিন্ন বহু প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে যাতে গানবাদ্য হারাম ও নাজায়েয বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে।

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত সুললিত কণ্ঠে উপকারী তথ্যপূর্ণ কবিতা পাঠ নিষিদ্ধ নয় ঃ অপর পক্ষে কতক রেওয়ায়েত থেকে গান বৈধ বলেও জানা যায়। এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান এই যে, তবলা, সারিন্দা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রযুক্ত নারীকণ্ঠ নিঃসৃত গান হারাম। যেমন উপরোক্ত কোরআনী আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কেবল সুললিত কণ্ঠে যদি কোন কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক কোন নারী বা কিশোর না হয়, সাথে সাথে কবিতার বিষয়বস্তু অশ্লীল বা অন্য কোন পাপ-পঙ্কিলতাযুক্ত না হয়, তবে জায়েয।

কোন কোন সূফী সাধক গান শুনেছেন বলে যে কথা প্রচলিত আছে তা এ ধরনের বৈধ গানেরই অন্তর্ভুক্ত, কেননা তাঁদের শরীয়তের অনুসরণ ও রসূল (সা)-এর অনুগমন দিবালোকের ন্যায় সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট। তাঁদের সম্পর্কে এরূপ পাপে জড়িয়ে পড়ার ধারণাও করা যেতে পারে না। অনুসন্ধানী সূফীগণ নিজেরাই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ

أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا
خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾

(১০) তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন; তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্তু। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতপর তাতে উদ্গত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদরাজি। (১১) এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। অতপর তিনি ব্যতীত অন্যেরা যা সৃষ্টি করেছে, তা আমাকে দেখাও। বরং জালিমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ পাক আসমানসমূহকে স্তম্ভ ব্যতীতই সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ। এবং ভূ-পৃষ্ঠে সুবিশাল পর্বতসমূহ স্থাপন করে রেখেছেন; যেন পৃথিবী তোমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয়---কোন দিকে ঝুঁকে না পড়ে। এবং ভূ-পৃষ্ঠের উপর সর্বত্র সকল প্রকারের জীবজন্তু সম্প্রসারিত করে রেখেছেন। এবং আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, অতপর ভূ-পৃষ্ঠে সকল প্রকারের উত্তম উদ্ভিদ ও তরুলতা উদ্গত করেছি। (এবং যারা আমার অংশী স্থির করে তাদেরকে বলুন) এগুলো তো আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তু (এখন যদি তোমরা অন্যদেরকে আল্লাহ্ পাকের অংশীদার স্থির করে থাক) তবে তিনি ভিন্ন (তোমাদের স্থিরীকৃত অন্যান্য মাবুদ) যে সব বস্তু সৃষ্টি করেছে সেগুলো আমাকে প্রদর্শন কর [যাতে করে তাদের আল্লাহ্ বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। এ প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে এ সব লোকের সঠিক পথ (হিদায়ত) পেয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তারা সে হিদায়ত গ্রহণ করলো না।] বরং এসব অত্যাচারী রীতিমত স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পড়ে আছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا এই একই বিষয়ে পূর্বে আলোচিত সূরায়েরাদের প্রথমদিকে এক আয়াত রয়েছে ঃ — اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ

تَرَوْنَهَا ব্যাকরণগত শব্দ প্রকরণ অনুযায়ী এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে ঃ

(১) صفت-এর عمد-কে ترونها (বিশেষণ) রূপে পরিগণিত করে এর ضمير (সর্বনাম)-কে عمد-এর প্রতি ধাবিত করা---তখন অর্থ হবে----আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহকে স্তম্ভবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অর্থাৎ স্তম্ভ থাকলে তোমরা তা অবলোকন করতে। যখন স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না তখন বোঝা গেল যে, বিশাল ছাদরূপ এ আকাশ স্তম্ভবিহীনভাবে তৈরী করা হয়েছে। এ তফসীর হযরত হাসান এবং কাতাদাহ (র) কৃত। (ইবনে কাসীর)

(২) ترونها-এর ضمير (সর্বনাম) سموات -এর দিকে ধাবিত। এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বাক্য বলে পরিগণিত হবে।---অর্থ হবে যে, তোমরা আকাশসমূহ দেখতে পাচ্ছ, মহান আল্লাহ্ সেগুলোকে স্তম্ভবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম বাক্য প্রকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আকাশ স্তম্ভসমূহের উপর সংস্থাপিত---সেগুলো তোমরা দেখতে সক্ষম নও---সেগুলো অদৃশ্য বস্তু। এটা হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরামাহ ও মুজাহিদ কৃত তফসীর। (ইবনে-কাসীর)

সর্বাবস্থায় এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক এই বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত আকাশকে কোন স্তম্ভবিহীনভাবে সুবিশাল ছাদরূপে সৃষ্টি করাকে তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও সৃষ্টি-কৌশলের উজ্জ্বল নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলেন এবং সাধারণভাবে প্রচলিত যে, আকাশ একটি গোলাকার বস্তু এবং এরূপ গোলাকার বস্তুতে সাধারণত কোন স্তম্ভ থাকে না। তা হলে আকাশের স্তম্ভ না থাকার কি বিশেষত্ব আছে ?

এর উত্তর এরূপ হতে পারে যে, কোরআনে করীম যেরূপভাবে অধিকাংশ জায়গায় পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে---যা বাহ্যত গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী। কিন্তু এর বিশালত্ব ও সুবিস্তীর্ণতার দরুন সাধারণ দৃষ্টিতে তা সমতল বলে প্রতীয়মান হয়। এই সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করেই কোরআনে করীম একে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে। অনুরূপভাবে আকাশ একটি ছাদের মত পরিদৃষ্ট হয়---যা নির্মাণের জন্য সাধারণত স্তম্ভের প্রয়োজন। সাধারণভাবে প্রচলিত এরূপ ধারণা অনুযায়ীই আকাশকে স্তম্ভবিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা---কুদরতে কামেলা প্রকাশ ও প্রমাণের জন্য এই সুবিশাল গোলকের সৃষ্টিই যথেষ্ট। ইবনে-কাসীর এবং কিছুসংখ্যক তফসীরকারের গবেষণা নিঃসৃত সিদ্ধান্ত এই যে, কোরআন হাদীস অনুসারে আকাশ ও পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার হওয়ার প্রমাণ মেলে না। বরং কোরআনের কতক আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী উহা গুম্বজাকৃতি বলে জানা যায়। তাদের বক্তব্য এই যে, এক সহীহ হাদীসে সূর্য

আরশের পাদদেশে পৌঁছে সিজদা করে বলে যে বর্ণনা রয়েছে আকাশ পূর্ণ গোলাকার না হলে পরই তা হওয়া সম্ভব। কেননা কেবল এ অবস্থাতেই এর উর্ধ্ব ও নিম্নদিক নির্ধারিত হতে পারে।---পরিপূর্ণ গোলকের কোন দিককে উপর বা নিচ বলা চলে না।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا
يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿١٢﴾ وَاِذْ قَالَ
لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ
عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ
وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿١٤﴾ وَاِنْ
جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۖ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ
اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾ يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ
اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾ يٰبُنَيَّ
اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ
عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ
لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ
اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾

(১২) আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (১৩) যখন লোকমান উপদেশছলে তার পুত্রকে বলল ঃ হে বৎস, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। (১৪) আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু'বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। (১৫) পিতামাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহ-অবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো। (১৬) হে বৎস! কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় অতপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে তবে আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন। (১৭) হে বৎস! নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। (১৮) অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্ভভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (১৯) পদচারণায় মধ্যবর্তিতার অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি হযরত লোকমানকে প্রজ্ঞা (যার প্রকৃত অর্থ কর্মসহ জ্ঞান) প্রদান করেছি। (এবং সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদান করেছি) যে (সাধারণভাবে যাবতীয় অনুগ্রহ এবং বিশেষভাবে প্রজ্ঞারূপ শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহের জন্য) মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃত-জ্ঞতা প্রকাশ করতে থাক। এবং যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে---তার নিজস্ব লাভের উদ্দেশ্যে করে (অর্থাৎ এর দরুন তার নিয়ামত ও সম্পদে বৃদ্ধি লাভ মূলত তারই উপকার। যেমন আল্লাহ্ পাক ফরমান ঃ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

ধর্মীয় সম্পদের সমৃদ্ধি ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই হবে। দুনিয়ায় তো নিয়া-মতের শুকরিয়া আদায় করলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং আমলের তওফীক বৃদ্ধি লাভ করে। আর পরকালের বিপুল সওয়াবের অধিকারী হবে। ইহকালে পরকালের অগ্র-গতি অর্থাৎ সওয়াব বৃদ্ধি লাভ তো একেবারে সুনিশ্চিত। আবার কখনো কখনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ফলে পার্থিব সম্পদও বেড়ে যায়) এবং যে অকৃতজ্ঞ হবে সে তার নিজস্ব ক্ষতিই সাধন করবে। কারণ আল্লাহ্ পাক তো কারো মুখাপেক্ষী নন এবং

যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীর অধিকারী। (অর্থাৎ যেহেতু তাঁর মহান সত্তা একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং حميد যাবতীয় প্রশংসা ও গুণাবলীর অধিকারী বলতে তাই বোঝায়। সুতরাং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।---কারো কৃতজ্ঞতা বা স্তুতিবাক্যের তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। এমনটি হলে তাঁর অপরের সাহায্যে পূর্ণতা অর্জন বোঝাবে। এবং যেহেতু লোকমান প্রজ্ঞা---অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মগুণে গুণান্বিত ছিলেন, যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, তাঁকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রণালী শিক্ষা প্রদানের জন্যও তিনি হয়ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকবেন। সুতরাং তিনি কৃতজ্ঞও ছিলেন। যার ফলে তাঁর প্রজ্ঞায় উন্নতি ঘটেছিল। যদ্দরুন তিনি সর্বোচ্চ শ্রেণীর প্রজ্ঞাবানে পরিণত হন।) এবং (এরূপ প্রজ্ঞাবানের শিক্ষা অবশ্যই অনুকরণযোগ্য। সুতরাং তাঁর শিক্ষা ও উপদেশাবলী জন-মণ্ডলীর নিকটে বর্ণনা করুন) যখন লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশছলে বললেন, হে বৎস! আল্লাহ্ পাকের কোন অংশীদার স্থাপন করো না; কেননা, অংশীস্থাপন (শিরক) নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ। (আলিমগণের মতে যুলুমের অর্থ কোন বস্তুকে যথাস্থানে ব্যবহার না করা; এবং একথা শিরকের ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রযোজ্য।) এবং (কাহিনীর মধ্যস্থলে তওহীদের উপর জোর প্রদান উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন যে) আমি মানবকে তার পিতামাতা সম্পর্কে বিশেষ আদেশ প্রদান করেছি (যেন তাঁদেরকে মান্য করে এবং তাঁদের সেবাযত্ন করে। কেননা, মাতা-পিতা বিশেষ করে মা তাদের জন্য নানাবিধ জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। বস্তুত) মা দুঃখের উপর দুঃখ সয়ে তাদেরকে উদরে বহন করেছেন (কেননা গর্ভধারণ কাল বৃদ্ধির সাথে সাথে গর্ভবতীর দুঃখ-কষ্টের মাত্রাও বেড়ে যায়) এবং দুবছর পর্যন্ত স্তন্য দানের পর তা ছাড়াতে হয় (এ সময়ে মা সব ধরনের সেবাযত্ন করে থাকেন। অনুরূপভাবে পিতাও অবস্থানুযায়ী ত্যাগ স্বীকার ও নানা প্রকারের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। তাই আমি আমার প্রাপ্যসমূহ আদায়ের সাথে সাথে পিতামাতার প্রাপ্যসমূহ আদায় করার নির্দেশও প্রদান করেছি। তাই এ ইরশাদ করেছি) যেন তুমি আমার প্রতি এবং তোমার পিতামাতা উভয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (আল্লাহ্ পাকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার তো তাঁর ইবাদত ও তাঁর প্রতি সঠিক আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে হয়। আর পিতামাতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার হয় তাঁদের খিদমত ও শরীয়ত নির্ধারিত তাঁদের প্রাপ্য-সমূহ আদায়ের মাধ্যমে) কেননা আমার নিকটেই (সকলের) ফিরে আসতে হবে (সে সময়েই কর্মফল---পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করবো। এ জন্য নির্দেশাবলী পালন অবশ্য কর্তব্য) এবং (পিতামাতার এরূপ অধিকার থাকা সত্ত্বেও 'তওহীদ' এমন সুমহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে) যদি তারা উভয়েও তোমাদের উপর আমার সহিত এমন কোন বস্তুকে অংশী স্থির করতে পীড়াপীড়ি করেন যার (আল্লাহ্ পাকের অংশী হওয়ার) ব্যাপারে তোমার নিকটে কোন প্রমাণ নেই। (এবং একথা সুস্পষ্ট যে, এমন কোন বস্তু নেই যার অংশী হওয়ার যোগ্যতার সপক্ষে কোন প্রমাণ রয়েছে; বরং অযোগ্য হওয়ার সম্পর্কে অসংখ্য প্রমাণাদি রয়েছে। সুতরাং সারকথা এই যে, যদি তারা কোন বস্তুকে আল্লাহ্র অংশী স্থাপন করতে তোমাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করে) তবে তাদের একথা মানবে না এবং (একথা অবশ্যই ঠিক যে) দুনিয়ার (পার্থিব

প্রয়োজনাদি ও পারস্পরিক আদান-প্রদান যথা---তাদের আবশ্যকীয় খরচাদি, সেবাযত্ন প্রভৃতির) ক্ষেত্রে তাদের সহিত সদ্ব্যবহার রক্ষা করে চলবে। এবং (ধর্মীয় ব্যাপারে শুধু) এমন ব্যক্তির পথ অনুসরণ করবে যে আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।—(অর্থাৎ আমার নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্বাসী এবং সেগুলোর অনুসারী) অতপর তোমাদের সবাইকে আমার নিকটে ফিরে আসতে হবে। তৎপর (আগমনক্ষণে) তোমরা যা কিছু করতে, সে সব কিছু সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করে দেব। (সুতরাং আমার নির্দেশের পরিপন্থী কোন কাজ করো না। এরপরে মহাত্মা লোকমান কর্তৃক তাঁর পুত্রের উদ্দেশে কৃত উপদেশাবলীর অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে। তিনি তওহীদ ও আকায়েদ প্রসঙ্গে এ উপদেশও প্রদান করেন যে,) বৎস, (মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও ক্ষমতা এমন অসীম যে,) যদি (কারো) কোন কাজ (যত প্রচ্ছন্নই থাকুক না কেন! উদাহরণ স্বরূপ ধরলেও যে তা পরিমাণে) একটি সরষে বীজ তুল্য। আবার (ধরে নাও যে) তা কোন পাথরের অভ্যন্তরে (লুকিয়ে) রাখা হয়েছে (এটা এমন আবরণ, যা হটানো একান্ত দুষ্কর এবং তা না হটিয়ে এর ভেতর সম্পর্কে কোন জ্ঞান লাভ সম্ভবপর নয়) অথবা তা আকাশের অভ্যন্তরে থাকুক (যা সাধারণ সৃষ্টবস্তুসমূহ থেকে অবস্থানগতভাবে বহু দূরে) অথবা তা ভূ-তলে থাকুক (যে জায়গা গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। সাধারণ সৃষ্টবস্তুর দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন থাকার এগুলোই কারণ। কেননা কখনো কখনো কোন বস্তু ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে দৃষ্টিগোচর হয় না; আবার কখনো কঠিন আবরণে আচ্ছন্ন থাকার কারণে; কখনো বহু দূরে অবস্থিত বলে, কখনো ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের ফলে। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের এমনই শান যে, প্রচ্ছন্ন থাকার উল্লিখিত যাবতীয় কারণও যদি বর্তমান থাকে) তবুও (কিয়ামতের দিনে হিসাব-নিকাশের সময়) আল্লাহ্ পাক তা উপস্থিত করবেন। (এদ্বারা তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও ক্ষমতা উভয়ই প্রমাণিত হলো।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞাত। (এবং কর্ম সম্পর্কে এ উপদেশ প্রদান করেন) হে বৎস! নামায প্রতিষ্ঠা করবে (যা আকায়েদ পরিশুদ্ধির পরবর্তী সর্বশ্রেষ্ঠ আমল) এবং (যেরূপভাবে আকীদা ও আমল পরিশুদ্ধির মাধ্যমে নিজের পূর্ণতা লাভ করলে, অনুরূপভাবে অপরের পূর্ণতা অর্জনের জন্যও সচেষ্ট থাকা চাই; সুতরাং লোকদেরকে) সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং (এই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে গিয়ে বিশেষভাবে এবং সকল অবস্থায় সাধারণভাবে) তোমার উপর যে বিপদাপদ আপতিত হবে, তাতে ধৈর্য ধারণ করবে। এটা (এরূপ ধৈর্য ধারণ) উন্নত মনোবল ও সৎসাহসিকতাপূর্ণ কাজ এবং (স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে এ উপদেশ প্রদান করেন যে, হে বৎস) মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না এবং ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে পদ-চারণা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন দাম্ভিক ও আত্মগর্বী লোককে ভালবাসেন না। এবং চলাফেরায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। [খুব দ্রুতগতিতেও চলো না, যা ব্যক্তিত্ব ও মান-মর্যাদার পরিপন্থী---এতে পড়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আবার আত্মাভিমানীদের ন্যায় একেবারে গণে গণেও পা ফেলো না; বরং কৃত্রিমতা-বিমুক্ত মধ্যম গতি, বিনম্র ও সাদাসিধে চালচলন অবলম্বন কর। যা অন্য আয়াতে

يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا (তারা ধরাপৃষ্ঠে অতি বিনম্রভাবে চলাফেরা করে) এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে] এবং (বাক্যালাপের সময়) অনুচ্চস্বরে কথা বলবে। (অর্থাৎ শোরগোল করে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, এমন মৃদু স্বরে কথা বলবে যে, অপর লোক তা শুনতেও পাবে না। পরবর্তী পর্যায়ে হৈ-হুল্লোড়ের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে,) বস্তুত গাধার চীৎকারই স্বরসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতর। (সুতরাং মানুষ হয়ে গাধার ন্যায় বিকট রবে চীৎকার করা শোভা পায় না। এতদ্ভিন্ন উচ্চরবে চীৎকার কোন কোন সময় অপরকে পীড়া দেয় ও তাদের বিরক্তির কারণ ঘটায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ——ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহের বর্ণনানুযায়ী মহাত্মা লোকমান হযরত আইয়্যুব (আ)-এর ভাগ্নে ছিলেন। মুকাতেল তাঁর খালাতো ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। 'বায়যাবী' ও অন্যান্য তফসীরে রয়েছে যে, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এবং হযরত দাউদ (আ)-এর সময়েও বেঁচে ছিলেন। একথা অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকেও প্রমাণিত যে, মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ (আ)-এর কালেও বর্তমান ছিলেন।

তফসীরে দুররে মনসূরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনানুযায়ী লোকমান জনৈক আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন——কাঠ চেরার কাজ করতেন। (ইবনে আবী শায়বাহ্, আহমদ, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুন্‌যির প্রমুখ যুহদ্ নামক গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন।) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র নিকটে তাঁর (লোকমান) অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন যে, তিনি চেপ্টা ও থেবড়া নাক বিশিষ্ট, বেঁটে আকারের আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন যে, তিনি ফাটা পা ও পুরো ঠোঁট বিশিষ্ট আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন।----(ইবনে কাসীর)

জনৈক কৃষ্ণকায় হাবশী হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের খিদমতে কোন মাস-'আলা জিজ্ঞেস করতে হাযির হয়। হযরত সাঈদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি কৃষ্ণকায় বলে দুঃখ করো না। কারণ কালো বর্ণধারীদের মধ্যে এমন তিনজন মহান ব্যক্তি আছেন, যাঁরা মানবকুলে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত——হযরত বিলাল, হযরত ওমর বিন খাত্তাব কর্তৃক মুক্ত গোলাম হযরত 'মাহজা' এবং হযরত লোকমান (আ)।

প্রাচীন ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের মতে হযরত লোকমান কোন নবী ছিলেন না; বরং ওলী, প্রজ্ঞাবান ও বিশিষ্ট মনীষী ছিলেনঃ ইবনে কাসীর বলেন যে, প্রাচীন ইসলামী মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেবল হযরত

ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এর বর্ণনা সূত্র (সনদ) দুর্বল। ইমাম বাগাবী বলেন যে, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না।---(মাযহারী)

ইবনে কাসীর (র) বলেন যে, তাঁর সম্পর্কে হযরত কাতাদাহ্ (রা) থেকে এক বিস্ময়কর রেওয়ায়েত আছে যে, আল্লাহ্ পাক হযরত লোকমানকে নবুয়ত ও হিক্‌মত (প্রজ্ঞা)---দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি হিক্‌মতই (প্রজ্ঞা) গ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁকে নবুয়ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরয করলেন যে, "যদি আমার প্রতি এটা গ্রহণ করার নির্দেশ হয়ে থাকে তবে তা শিরোধার্য। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা করুন।"

হযরত কাতাদাহ (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, মনীষী লোকমানের নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল যে, আপনি হিক্‌মতকে (প্রজ্ঞা) নবুয়ত থেকে সমধিক গ্রহণযোগ্য কেন মনে করলেন, যখন আপনাকে যে কোন একটা গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল? তিনি বললেন যে, নবুয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা আমার ইচ্ছা ব্যতীতই প্রদান করা হতো, তবে স্বয়ং মহান আল্লাহ্ তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, যাতে আমি সে কর্তব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম হই। কিন্তু যদি আমি তা স্বেচ্ছায় চেয়ে নিতাম তবে সে দায়িত্ব আমার উপর বর্তাতো।---(ইবনে কাসীর)

যখন মহাত্মা লোকমানের নবী না হওয়ার কথা অধিকাংশ ইসলামী বিশেষজ্ঞ কর্তৃক স্বীকৃত, তখন তাঁর প্রতি কোরআনে বর্ণিত যে নির্দেশ أَنِ اشْكُرْ لِي (আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর)--তা ইলহামের মাধ্যমেও হতে পারে, যা আল্লাহ্‌র ওলীগণ লাভ করে থাকেন।

মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ (আ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে শরীয়তী মাস-'আলাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট ফতোয়া দিতেন। হযরত দাউদ (আ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি এ ফতোয়া প্রদানকার্য পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, এখন আর তার প্রয়োজন নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি ইসরাঈল গোত্রের বিচারপতি ছিলেন। হযরত লোকমানের বহু জ্ঞানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ্ বলেন যে, আমি হযরত লোকমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দশ হাজারের চাইতেও বেশি অধ্যায় অধ্যয়ন করেছি।---(কুরতুবী)

একদিন হযরত লোকমান এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জন-মণ্ডলীকে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনি কি সেই ব্যক্তি—যে আমার সাথে অমুক বনে ছাগল চরাতো। লোকমান বললেন, হ্যাঁ---আমি সে লোকই। অতপর লোকটি বললো, তবে আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন যে, আল্লাহ্‌র গোটা সৃষ্টিকুল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার বাণী শোনার জন্য দূরদূরান্ত থেকে লোক এসে জমায়েত হয়? প্রতি-উত্তরে

লোকমান বললেন যে, এর কারণ আমার দুটি কাজ---এক. সর্বদা সত্য বলা, দুই. অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত লোকমান বলেছেন, এমন কতকগুলো কাজ আছে যা আমাকে এ স্তরে উন্নীত করেছে। যদি তুমি তা গ্রহণ কর তবে তুমিও এ মর্যাদা ও স্থান লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো এই ঃ নিজের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে তুষ্ট থাকা, নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সত্য কথায় অটল থাকা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, মেহমানের আদর-আপ্যায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশীর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা।---(ইবনে কাসীর)

হযরত লোকমানকে প্রদত্ত হিকমতের অর্থ কি? حكمت শব্দটি কোরআনে করীমে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে---বিদ্যা, বিবেক, গাম্ভীর্য, নবুয়ত, মতের বিশুদ্ধতা।

আবূ 'হাইয়্যান' বলেছেন যে, হিকমত বলতে সেসব বাক্য সমষ্টিকে বোঝায় যদ্দ্বারা মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, তাদের অন্তরকে প্রভাবান্বিত করে এবং যা মানুষ সংরক্ষণ করে অপরের নিকটে পৌঁছায়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, হিকমত অর্থ---বিবেক, প্রজ্ঞা ও মেধা। আবার কোন কোন মনীষী বলেন, জ্ঞানানুসারে কাজ করার নাম হিকমত। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলোর মধ্যে কোন প্রকারের বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই।---এগুলো সবই হিকমতের অন্তর্গত। উপরের তফসীরের সার-সংক্ষেপে হিকমতের অনুবাদ 'প্রজ্ঞা' বলে এবং তার ব্যাখ্যা 'কার্যে পরিণত জ্ঞান' বলে করা হয়েছে, যা সর্বব্যাপী ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

উল্লিখিত আয়াতে হযরত লোকমানকে প্রজ্ঞা (হিকমত) প্রদানের কথা বর্ণনার পর বলা হয়েছে ঃ اَنِ اشْكُرْ لِىْ (আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর) এতে এক সম্ভাবনা তো এই রয়েছে যে, এখানে قُلْنَا (আমরা বললাম) শব্দটি উহ্য আছে বলে ধরে নেওয়া। অর্থ হবে এই যে, আমি (আল্লাহ্) লোকমানকে প্রজ্ঞা (হিকমত) প্রদান পূর্বক এ নির্দেশ দিলাম যে, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আবার কোন কোন মনীষী বলেন যে, اَنِ اشْكُرْ لِىْ স্বয়ং হিকমতেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ লোকমানকে যে হিকমত প্রদান করা হয়েছিল তা হলো তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ---যা সে কার্যে পরিণত করেছে। তখন এর মর্মার্থ হবে এই যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণাবলীর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সর্বশ্রেষ্ঠ হিকমত। অতপর এ বিষয় অবহিত করে দেন যে আমি যে শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দিলাম---তা আমার কোন নিজস্ব লাভের জন্য নয়। আমার কারো কৃতজ্ঞতার কোন প্রয়োজন নেই; বরং এ নির্দেশ

তারই উপকারার্থে দিয়েছি। কারণ আমার চিরন্তন বিধান, যে ব্যক্তি আমার প্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে, আমি তার নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবো।

অতপর মহাত্মা লোকমানের কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ বাণী বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলো তিনি তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন, যাতে অন্যান্য লোকও উপকৃত হতে পারে। সেজন্য কোরআনে করীমও সেসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ উল্লেখ করেছে।

এসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে হলো আকীদাসমূহের পরিশুদ্ধিতা। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম কথা হলো, কোন প্রকারের অংশীদারিত্ব স্থির না করে আল্লাহ্ পাককে গোটা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করা। সাথে সাথে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনা-আরাধনায় অংশী স্থাপন না করা। আল্লাহ্ পাকের কোন সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করার মত গুরুতর অপরাধ দুনিয়াতে আর কিছু হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন ঃ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

(হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহ্র অংশী স্থির করো না, অংশী স্থাপন করা গুরুতর জুলুম।) পরবর্তী পর্যায়ে মনীষী লোকমানের অন্যান্য উপদেশ্য ও জ্ঞানগর্ভ বাণী-সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, যা তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন। শির্ক যে গুরুতর অপরাধ; সুতরাং কোন অবস্থাতেই এর নিকটবর্তী না হওয়ার হিদায়তের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক অন্য এক নির্দেশ দান করেন।

মাতাপিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাদেরকে মান্য করা ফরয; কিন্তু আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ-বিরোধী হলে অন্য কারো আনুগত্য জায়েয নয়ঃ আল্লাহ্ পাক ফরমান যে, যদিও সন্তানের প্রতি পিতামাতাকে মান্য করার ও তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিশেষ তাকীদ রয়েছে এবং নিজের (আল্লাহ্র) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে পিতামাতার প্রতিও তা করার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শির্ক এমন গুরুতর অন্যায় ও মারাত্মক অপরাধ যে, মাতাপিতার নির্দেশে এমনকি বাধ্য করলে পরও কারো পক্ষে তা জায়েয হয়ে যায় না। যদি কারো পিতামাতা তাকে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকেন এ বিষয়ে পিতামাতার কথাও রক্ষা করা জায়েয নয়।

এখানে যখন পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকা-রের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হিকমত ও অন্তর্নিহিত রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে, তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। নয় মাস কাল উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। আবার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা পোহায়েছেন, যাতে দিনরাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে

তাঁর দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সন্তানের লালন-পালন ক্ষেত্রে মাকেই যেহেতু অধিক ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়, সেজন্য শরীয়তে মায়ের স্থান ও অধিকার পিতার অগ্রে রাখা হয়েছে وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ আয়াতের মর্ম ইহাই। অতপর وَإِنْ جَاهَدَاكَ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন-বিষয়ে পিতা-মাতাকে মান্য করাও হারাম।

ইসলামের অনন্য ন্যায়নীতি ঃ যদি পিতামাতা আল্লাহ্র অংশী স্থাপনে বাধ্য করার চেষ্টা করেন, তখন আল্লাহ্র নির্দেশ হল তাঁদের কথা না মানা। এমতাবস্থায় মানুষ স্বভাবত সীমার মধ্যে স্থির থাকে না। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষে পিতামাতার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ প্রদর্শন করে তাঁদেরকে অপমানিত করার আশংকা ছিল। ইসলাম তো ন্যায়নীতির জ্বলন্ত প্রতীক---প্রত্যেক বস্তুরই একটি সীমা আছে। তাই অংশী স্থাপনের বেলায় পিতামাতার অনুসরণ না করার নির্দেশের সাথে সাথে এ হুকুমও প্রদান করেছে ঃ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

---অর্থাৎ দীন সংক্রান্ত ব্যাপারে তো তাঁদের কথা মানবে না। কিন্তু পার্থিব কাজকর্ম ---যথা শারীরিক সেবাযত্ন বা ধনসম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন কার্পণ্য প্রদর্শিত না হয়; বরং পার্থিব বিষয়াদিতে সাধারণ নিয়মানুযায়ী কাজকর্ম করবে। তাঁদের প্রতি বেয়াদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করো না। তাদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর দিও না, যাতে অহেতুক মনোবেদনার উদ্রেক করে। মোট কথা, শিরক-কুফরীর ক্ষেত্রে তাঁদের কথা না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার উদ্রেক হবে, তা তো অপারকতা হেতু বরদাশ্ত করবে। কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যান্য ব্যাপারে যেন মনোকষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

বিসেষ দ্রষ্টব্য ঃ---এ আয়াতে দুধ ছাড়ানোর কাল যে দু'বছর বলা হয়েছে---তা প্রচলিত সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী। এখানে এর কোন ব্যাখ্যা বা স্পষ্ট বর্ণনা নেই যে, এর চাইতে অধিককাল দুধ পান করালে তার কি হুকুম। এ মাস'আলার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সূরায়ে আহ্কাফ এর حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا আয়াতে ইনশাল্লাহ্ করা হবে।

মহাত্মা লোকমানের দ্বিতীয় উপদেশ আকায়েদ সম্পর্কে ঃ অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে এর প্রতিটি বিন্দুকণা আল্লাহ্ পাকের অসীম জ্ঞানের আওতাধীন; এবং সব কিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। কোন বস্তু যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় না,

অনুরূপভাবে কোন বস্তু যত দূরেই অবস্থিত থাক না কেন অথবা কোন বস্তু যত গভীর আঁধার বা যবনিকার অন্তরালেই থাক না কেন মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না এবং তিনি যে কোন বস্তুকে যখন ও যেখানে চান উপস্থিত করতে পারেন। يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ الاية-এর মর্মার্থ তাই। যাবতীয় বস্তু মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়ে থাকা---ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং একত্ববাদের আকীদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলীল।

মহাত্মা লোকমানের তৃতীয় উপদেশ কর্ম পরিশুদ্ধিতা সম্পর্কেঃ অবশ্য করণীয় কাজ তো অনেক। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামায এবং গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য কাজের পরিশুদ্ধির কারণ ও মাধ্যমও বটে। যেমন নামায সম্পর্কে মহান পালনকর্তার ইরশাদ রয়েছেঃ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ (নিশ্চয়ই নামায যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে)। এজন্য অবশ্য করণীয় সৎকাজগুলোর মধ্য হতে শুধু নামাযের বর্ণনা দিয়েই যথেষ্ট করেছেন। يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ—অর্থাৎ হে বৎস! নামায প্রতিষ্ঠা কর। যেমন আগে বলা হয়েছে যে, নামায প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামায পড়ে নেওয়া নয়, বরং যাবতীয় অংগসমূহ ও নিয়মাবলী পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা---যথাসময়ে আদায় করা, এর উপর স্থায়ী ও দৃঢ়পদ থাকা---এসবই নামায প্রতিষ্ঠার মর্মের অন্তর্গত।

মহাত্মা লোকমানের চতুর্থ উপদেশ চরিত্র সংশোধন সম্পর্কেঃ ইসলাম একটি সমষ্টিগত ধর্ম---ব্যক্তির সাথে সাথে সমষ্টির সংশোধন এ জীবন ব্যবস্থার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংগ। এজন্য নামাযের ন্যায় অবশ্য করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সাথেই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ---এ অবশ্য করণীয় কর্তব্যের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—মানুষকে সৎকাজের প্রতি আহবান কর ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখ। এক. নিজের পরিশুদ্ধি, দ্বিতীয়. গোটা মানবকুলের পরিশুদ্ধি---এর উভয়টাই পালন করতে বেশ দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করতে হয়, শ্রম সাধনার প্রয়োজন হয়। এর উপর দৃঢ়পদ থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে সৃষ্টিকুলের পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে সৎ কাজের আদেশের প্রতিদানে দুনিয়ায় সর্বদা শত্রুতা ও বিরোধিতাই জুটে থাকে। সুতরাং এ উপদেশের সাথে সাথে এরূপ উপদেশও প্রদান করা হয়েছে যে, وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ—অর্থাৎ এসব কাজ সম্পন্ন করতে যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে তাতে ধৈর্য ধারণ করে স্থিরতা অবলম্বন করবে।

মনীষী লোকমানের পঞ্চম উপদেশ সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে ঃ وَلَا تُصَعِّرْ

لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ -এর উৎপত্তি صعر ধাতু থেকে—যার অর্থ উটের এক প্রকার ব্যাধি—যার ফলে এর ঘাড় বেঁকে যায়। যেমন মানুষের 'লাকওয়া' নামক প্রসিদ্ধ ব্যাধি, যার ফলে মুখমণ্ডল বাঁকা হয়ে যায়। এর অর্থ চেহারা ফিরিয়ে রাখা। যার মর্ম এই যে, লোকের সাথে সাক্ষাৎ বা কথোপকথনের সময় মুখ ফিরিয়ে রেখো না—যা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অহংকারের নিদর্শন এবং ভদ্রোচিত স্বভাব ও আচরণের পরিপন্থী। وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا শব্দের অর্থ গর্বভরে ঔদ্ধত্যের সাথে বিচরণ করা অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ভূমিকে যাবতীয় বস্তু হতে নত ও পতিত করে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের সৃষ্টিও এ মাটি দিয়েই। তোমরা এর উপর দিয়েই চলাফেরা কর—নিজের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা কর। আত্মাভিমানীদের ধারা অনুসরণ করে অহংকার ভরে বিচরণ করো না। সুতরাং এরপর বলেছেন ঃ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ —আল্লাহ্ পাক কোন অহংকারী আত্মাভিমানীকে পছন্দ করেন না।

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ —অর্থাৎ নিজ গতিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, দৌড় ধাপসহও চলো না, যা ভব্যতা ও শালীনতার পরিপন্থী। হাদীস শরীফে আছে যে, দ্রুত-গতিতে চলা মু'মিনের সৌন্দর্য ও মর্যাদা হানিকর (জামে সগীর হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত)। এরূপভাবে চলার ফলে নিজেও দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশংকা আছে বা অপরের দুর্ঘটনার কারণও ঘটতে পারে। আবার অত্যধিক মন্থর গতিতেও চলো না—যা সেসব গর্বস্ফীত আত্মাভিমানীদের অভ্যাস যারা অন্যান্য মানুষের চাইতে নিজের অসার কৌলীন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে চায়। অথবা সেসব স্ত্রীলোকদের অভ্যাস, যারা অত্যধিক লজ্জা-সংকোচের দরুন দ্রুত গতিতে বিচরণ করে না। অথবা অক্ষম ব্যাধি-গ্রস্তদের অভ্যাস। প্রথমটি তো হারাম। দ্বিতীয়টি যদি নারী জাতির অনুসরণে করা হয় তাও না-জায়েয। আর যদিএ উদ্দেশ্য না থাকে তবে পুরুষের পক্ষে এটা একটা কলঙ্ক। তৃতীয় অবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন—সুস্থ থাকা সত্ত্বেও রোগগ্রস্তদের রূপ ধারণ করা।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ ফরমান যে সাহাবায়ে-কিরামকে ইহুদীদের মত দৌড়াতে বারণ করা হতো। আবার খৃস্টানদের ন্যায় ধীর গতিতে চলতেও বারণ করা হতো; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী চালচলন গ্রহণের নির্দেশ ছিল।

হযরত আয়েশা (রা) জনৈক ব্যক্তিকে অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলতে দেখলেন। মনে হচ্ছিল যেন সে এক্ষণি পড়ে যাবে। সুতরাং তিনি লোকের নিকটে তার এরূপ-ভাবে চলার কারণ জিজ্ঞেস করাতে তারা বললো যে, সে কারীগণের একজন; সে যুগে যারা বিশুদ্ধভাবে কোরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম ছিলেন---সাথে সাথে কোরআনের আলিমও ছিলেন তাঁদেরকেই কারী বলে আখ্যায়িত করা হতো। সারকথা, সে একজন আলিম ও কারী বলে এরূপভাবে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা (রা) ফরমান যে, খলীফা হযরত উমর (রা) এর চাইতে অনেক উন্নতমানের কারী। কিন্তু তিনি যখন পথ চলতেন দ্রুতগতিতে চলতেন (কিন্তু এমন দ্রুত নয় যেমন দ্রুত চলা নিষেধ)। তিনি কথা বলার সময় এমন আওয়াযে বলতেন যেন অপর লোক অনায়াসে তা শুনতে পায়; (এমন ক্ষীণভাবেও নয় যে, তিনি কি বললেন শ্রোতৃমণ্ডলীর তা আবার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয়)।

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ---অর্থাৎ তোমাদের স্বর ক্ষীণ কর। যার অর্থ স্বর প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চ করো না এবং হট্টগোল করো না। যেমন এইমাত্র ফারুকে আযম সম্পর্কে বলা হলো যে, তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যেন উপস্থিত জনমণ্ডলী অনায়াসে তা শুনতে পায়, কোন প্রকারের অসুবিধা না হয়।

--- إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ অতপর বলা হয়েছে ঃ

অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে গাধার চীৎকারই অত্যন্ত বিকট ও শ্রুতিকটু। এখানে সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। (১) লোকের সঙ্গে সাক্ষাত ও কথোপকথনকালে আত্মম্ভরিতার সুরে মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে। (২) ধরাপৃষ্ঠে অহংকার ভরে বিচরণ করতে বারণ করা হয়েছে। (৩) মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আচার-আচরণেও এসব গুণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল।

শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত হুসায়ন (রা) ফরমান---আমি আমার পিতা হযরত আলী (রা)-র নিকট রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মানুষের সাথে উঠাবসা ও মেলা-মেশার কালে আঁ হযরত (সা)-এর আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন ঃ

كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا ييئس منه ولا يجيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والاكبار وما لا يعنيه ـ

অর্থাৎ নবীজী (সা)-কে সর্বদা প্রসন্ন ও হাস্যোজ্জ্বল মনে হতো---তাঁর চরিত্রে নম্রতা, আচার-ব্যবহারে বিনয় বিদ্যমান ছিল। তাঁর স্বভাব মোটেই রুক্ষ ছিল না, কথা-বার্তাও নিরস ছিল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বা অশ্লীল কথা বলতেন না, কারো প্রতি দোষা-রোপ করতেন না। কৃপণতা প্রকাশ করতেন না। যে সব দ্রব্য মনঃপূত হতো না সেগুলোর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করতেন না। কিন্তু (সেগুলো হালাল হলে এবং তার প্রতি কারো আকর্ষণ থাকলে) তা থেকে তাদেরকে নিরাশ করতেন না এবং সে সম্পর্কে কোন মন্তব্যও করতেন না (বরং নীরবতা অবলম্বন করতেন), তিন বস্তু সম্পূর্ণভাবে (চিরতরে) বর্জন করেছিলেন। (১) ঝগড়া-বিবাদ (২) অহংকার (৩) অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন কাজে আত্মনিয়োগ করা।

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ؕ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٢٠﴾ وَاِذَا
قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ
السَّعِيْرِ ﴿٢١﴾ وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ
كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى
عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٢٤﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾ لِلّٰهِ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ اَنَّ مَا

فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ
أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ مَا خَلْقُكُمْ
وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾ أَلَمْ تَرَ
أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ
دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

(২০) তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? এমন লোকও আছে যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্ সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করে। (২১) তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে দাওয়াত দেয়, তবুও কি? (২২) যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ্ অভিমুখী করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র দিকে। (২৩) যে ব্যক্তি কুফরী করে, তার কুফরী যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। আমারই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন, অতপর আমি তাদের কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত

করব। অন্তরে যা কিছু রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ পরিজ্ঞাত। (২৪) আমি তাদেরকে স্বল্পকালের জন্য ভোগবিলাস করতে দেব, অতপর তাদেরকে বাধ্য করব গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে। (২৫) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বলুন, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্র। বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না। (২৬) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্র। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। (২৭) পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (২৮) তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান বৈ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। (২৯) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন? (৩০) এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহ্ই সত্য এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সব মিথ্যা। আল্লাহ্ সর্বোচ্চ, মহান। (৩১) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন? নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৩২) যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরংগ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহ্কে ডাকতে থাকে। অতপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা কি (সৃষ্টি জগতে বিরাজমান চাক্ষুষ প্রমাণাদি দ্বারা) একথা উপলব্ধি করতে পার না যে, আল্লাহ্ পাক যাবতীয় বস্তু যা ভূ-মণ্ডল বা নভোমণ্ডলে অবস্থিত (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) তোমাদের কাজ ও কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। এবং তিনি তোমাদেরকে তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে প্রদান করেছেন। (প্রকাশ্য যা চোখ-কান প্রভৃতির সাহায্যে উপলব্ধি করা যায় এবং অপ্রকাশ্য যা জ্ঞান ও বিবেকের সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়। এবং নিয়ামতরাজি দ্বারা সেসব নিয়ামত বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ পাক কর্তৃক নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ব্যবহারোপযোগী ও আয়ত্তাধীন করে দেওয়ার ফলে মানুষ লাভ করেছে। সুতরাং সব সম্বোধিত ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে এ থেকে একথা বোঝা যায় না। এসব দলীলাদি দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও) এমন কতক লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্ পাকের (একত্ব) সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা (অর্থাৎ বাস্তব জ্ঞান) কোন দলীল (অর্থাৎ বুদ্ধি ও বিবেক নিঃসৃত প্রমাণ-ভিত্তিক জ্ঞান) এবং কোন (সুস্পষ্ট) গ্রন্থ (অর্থাৎ

বর্ণনাভিত্তিক প্রমাণ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান) ব্যতীতই তর্ক ও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়। এবং যখন আল্লাহ্ পাক যে সব বিষয় অবতীর্ণ করেছেন, তাদের সেগুলো অনুসরণ করতে বলা হয় (অর্থাৎ হক প্রমাণকারী দলীলাদি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তা অনুসরণ করতে) তখন (প্রতি-উত্তরে) তারা বলে যে, (আমরা তো তা অনুসরণ করি) না। আমাদের পিতৃপুরুষকে যা করতে পেয়েছি আমরা (তো) তাই অনুসরণ করবো। (পরে তাদের এ যুক্তি খণ্ডন করে বলা হচ্ছে যে,) যদি শয়তান তাদের---পূর্বপুরুষকে জাহান্নামের শাস্তির প্রতি (অর্থাৎ পথভ্রষ্টতার প্রতি যা দোযখের শাস্তির কারণ) আহবান করতে থাকে তবুও কি! তারা তাদেরই অনুসরণ করবে? এর মর্ম এই যে, এরা এমন শত্রুভাবাপন্ন ও হঠকারী যে, যুক্তি ও প্রমাণের দিকে আহবান করা সত্ত্বেও কোন প্রমাণাদি ব্যতীত এবং প্রমাণের বিরুদ্ধে পথভ্রষ্ট পিতৃপুরুষের পথে চলতেই থাকে। এ তো বিভ্রান্তদেরই অবস্থা) আর যে ব্যক্তি সত্যানুগামী, নিজ মুখমণ্ডল আল্লাহ্র সামনে নত করে (অর্থাৎ আকীদা-আমল উভয় ক্ষেত্রে একান্ত বাধ্য ও অনুগত থাকে। এর অর্থ ইসলাম ও তওহীদ) এবং (সাথে সাথে) যে নিষ্ঠাবান ও ঐকান্তিকতা সম্পন্নও বটে (অর্থাৎ নিছক বাহ্যিক ইসলাম নয়) তবে সে অত্যন্ত সুদৃঢ় গ্রন্থি ধারণ করে নিয়েছে (অর্থাৎ সে ঐ ব্যক্তি সদৃশ হয়ে পড়েছে, যে কোন দৃঢ় রজ্জু হাতে ধারণ করে পড়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকে)। ফলে সে ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে অব্যাহতি পেয়েছে এবং পরিশেষে যাবতীয় কাজের পরিণাম ও ফলাফল আল্লাহ্র নিকটেই পৌঁছুবে (সুতরাং এসব আমলও অর্থাৎ হক ও বাতিলের অনুসরণের পরিণামফলও তার সম্মুখে পেশ করা হবে। বস্তুত তিনি প্রত্যেককে যথাযোগ্য পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন।) এবং যে ব্যক্তি (হক প্রমাণকারী দলীলাদি থাকা সত্ত্বেও) কুফরী করবে তার এ কুফরী আপনার দুশ্চিন্তার কারণ না হওয়া উচিত। (অর্থাৎ আপনি সন্তাপ প্রকাশ করবেন না।) এদের সবাইকে আমার নিকটেই ফিরে আসতে হবে। সে দুনিয়াতে যা করেছে তখন আমি তা সবই বর্ণনা করে দেব। কেননা আল্লাহ্ পাক অন্তরের কথাও ভালরূপে জ্ঞাত আছেন। (সুতরাং আমার নিকট কোন কিছুই প্রচ্ছন্ন নেই---সবকিছুই প্রকাশ করে যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করবো। এ সম্পর্কে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। যদি এসব লোক স্বল্পকালীন জীবনের উপর গর্বিত হয়ে থাকে তবে তা তাদের মারাত্মক ভুল। কেননা এ জীবনের কোন স্থায়িত্ব নেই। বরং) আমি তাদেরকে মাত্র কয়েক দিন উপভোগের সময় দিয়েছি। অনন্তর তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে টেনে টেনে নিয়ে আসবো (সুতরাং এর উপর আত্মম্ভরিতা নিছক মূর্খতা)। আর (যে তওহীদের প্রতি তাদেরকে আমি আহবান করছি, তারাও এর মর্ম সমর্থন করে। কিন্তু ঠিক ফললাভের কাজে তা ব্যবহার করে না। তাই) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন' বলে উত্তর দেবে। (অতপর) আপনি বলুন! যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্রই। (যে বিষয়টা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা তোমাদের স্বীকারোক্তির ফলে প্রমাণিত হয়ে গেল। এখন অপর বিষয়টি নিতান্ত স্পষ্ট যে, যা নিজেই সৃষ্ট তা উপাসনার

যোগ্য নয়। সুতরাং কাম্য বস্তু তো প্রমাণিত হলো কিন্তু তা মানে না।) বরং তাদের অধিকাংশ (তো গোটা বিষয় সম্পর্কেও) অবহিত নয় [তাই একেবারে সুস্পষ্ট অপর বিষয়টির প্রতিও তারা দৃষ্টিপাত করে না যে, মাবূদ (পূজ্য) রূপে পরিণত হওয়া কেবল স্রষ্টারই অধিকার---শুধু তাঁর জন্য মানায় এবং আল্লাহ্ পাকের স্বরূপ এবং মর্যাদা তো এই যে,] আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই কর্তৃত্বাধীন। (বস্তুত তাঁর রাজত্ব এমনই বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ) এবং আল্লাহ্ পাক (স্বয়ং) সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী (এবং যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীর অধিকারী। সুতরাং একমাত্র তিনিই উপাস্য হওয়ার যোগ্য) এবং (তাঁর গুণাবলী এতই অগণিত যে,) ধরাপৃষ্ঠে যত গাছপালা রয়েছে যদি তা সবগুলো কলমে রূপান্তরিত হয় (অর্থাৎ প্রচলিত কলমের সমান করে যাবতীয় গাছপালা খণ্ড খণ্ড করে যদি তা দিয়ে কলম তৈরি করা হয় এবং এটা সুস্পষ্ট যে, এরূপভাবে একই গাছ দিয়ে হাজার হাজার কলম তৈরি হবে এবং এই যে সমুদ্র---এর সাথে আরো সাত সমুদ্র সংযুক্ত হয়ে যদি কালিতে পরিণত হয়) এবং সে সব কলম ও কালি দিয়ে আল্লাহ্ পাকের মহিমা কৃতিত্ব-গাঁথা লিখতে আরম্ভ করা হয় তবে (কলম কালি নিঃশেষ হয়ে যাবে)। আল্লাহ্র বাক্যাবলী (অর্থাৎ যে সব বাক্যাবলী দিয়ে আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা ও স্তুতি এবং কৃতিত্বগাঁথা বর্ণনা করা হয়) শেষ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক মহা প্রজ্ঞাবান (অর্থাৎ তিনি ক্ষমতা ও জ্ঞান এবং উভয় ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার অধিকারী এবং এ দুটি গুণ যেহেতু অন্যান্য যাবতীয় গুণ ও কার্যক্রমের সহিত সম্পর্ক রাখে---সম্ভবত এজন্যই সাধারণভাবে যাবতীয় গুণ বর্ণনার পর আবার বিশেষভাবে এ দুটো গুণের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা গুণের পরিপূর্ণতার এক অংশ ও নিদর্শন পরজগতও বটে---নির্বোধরা তো তা কঠিন বলে মনে করে---অথচ তিনি এমন ক্ষমতাবান যে) তোমাদের সবার (প্রথমবার) সৃষ্টি এবং (দ্বিতীয় বার) জীবন দান (তাঁর পক্ষে) যেন ঠিক একটি মাত্র ব্যক্তিকে সৃষ্টি ও তাকে জীবন দানের ন্যায়। (যদিও এখানে স্থান দৃষ্টে পুনরুত্থানের বর্ণনাই উদ্দেশ্য; কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত করায় তা অধিক শক্তিশালী ও তাৎপর্যবহ হয়েছে।) আল্লাহ্ পাক নিঃসন্দেহে সবকিছু দেখেন ও শোনেন। (অতপর যেসব লোক এসব প্রমাণাদি সত্ত্বেও কিয়ামতের বিচার দিবস অস্বীকার করে এবং ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে গর্হিত ও অপকৃষ্ট কাজ এবং পাপাচারে লিপ্ত থাকে। আল্লাহ্ পাক তাদের এসব কীর্তিকাণ্ড দেখেছেন---শুনেছেন---এদের যথোচিত শাস্তিবিধানও করবেন। এরপর পুনরায় তওহীদের বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে,) তোমরা কি উপলব্ধি করতে পারছ না যে, আল্লাহ্ রাতের (কিছু অংশ) দিনের ভেতরে এবং দিনের (কিছু অংশ) রাতের ভেতরে প্রবিষ্ট করে-ছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে কাজে নিয়োজিত রেখেছেন (যে,) এবং প্রত্যেকটি এক নির্দিষ্ট সময় (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) চলতে থাকবে এবং (তোমার কি) একথা (জানা নেই) যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে জ্ঞাত (সুতরাং শিরকী পরিহার করাই এ সম্পর্কের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

আর উপরে যেসব কার্যাবলী কেবল মহান আল্লাহ্ পাকের সহিত নির্দিষ্ট করা হয়েছে) তা এ কারণে যে, শুধু আল্লাহ্ পাকই নিখুঁত ও পরিপূর্ণ সত্তার অধিকারী (ও অবিনশ্বর) এবং এরা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য যেসব বস্তুর উপাসনা করে তা সম্পূর্ণ অসত্য ও অযৌক্তিক এবং আল্লাহ্ পাক অতি মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ (সুতরাং) এসব কার্যক্রম তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। অবশ্য অন্যান্য সত্তা যদি অসত্য, নশ্বর ও ম্রিয়মাণ না হতো বরং 'নাউযুবিল্লাহ্' অপর কোন অবিনশ্বর সত্তার অস্তিত্ব থাকতো তবে এসব কার্যক্রম কেবল আল্লাহ্ পাকের জন্য নির্দিষ্ট থাকতো না যা একেবারে সুস্পষ্ট।

হে সম্বোধিত ব্যক্তি! তোমার কি (আল্লাহ্র একত্বের) এ (প্রমাণ) জানা নেই যে, আল্লাহ্ পাকের একান্ত অনুগ্রহেই সমুদ্র বক্ষে নৌকা চলাচল করে থাকে——যেন তিনি এতে তোমাদেরকে স্বীয় (কুদরতের) নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন। (ফলত প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব স্বীয় স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ ও সাক্ষ্য প্রদান করে। অনুরূপভাবে) এতেও প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র (কুদরতের) অজস্র নিদর্শন রয়েছে। (এ দ্বারা মু'মিনকেই বোঝানো হয়েছে; কেননা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করা কেবল এদেরই বৈশিষ্ট্য। এতদ্ভিন্ন সবর ও শুক্র বিশ্বজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতেও অনুপ্রাণিত করে এবং প্রমাণ লাভের জন্য চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা একান্ত আবশ্যক। তাই এই উভয় গুণ এ স্থলে বেশ উপযোগী হয়েছে। বিশেষত নৌকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে——কেননা, সমুত্থিত তরঙ্গমালা ধৈর্য ধারণের স্থল এবং নিরাপদে তীরে পৌঁছানো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থল। বস্তুত এসব ঘটনা সম্পর্কে যারা গবেষণা করেন প্রমাণ লাভের তওফীক তাঁরাই পেয়ে থাকেন) এবং (যেমন পূর্বোল্লিখিত আয়াত وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ এ--

উক্ত কাফিরদের পক্ষ থেকে যেরূপভাবে দলীলের বিষয়াদির স্বীকৃতি পাওয়া যায়, কোন কোন সময় স্বয়ং দলীলের ফলশ্রুতি অর্থাৎ তওহীদ সম্পর্কেও স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করে থাকে। যদ্দ্বারা তওহীদ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেল। তাই) যখন তাদেরকে শামিয়ানা (অর্থাৎ মেঘমালা) সদৃশ তরঙ্গরাজি (তাদের চতুর্দিকে) পরিবেষ্টিত করে ফেলে তখন তারা অকপট বিশ্বাসে আল্লাহ্ পাককে আহবান করতে থাকে। অনন্তর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে ভূ-ভাগের দিকে নিয়ে আসেন, তখন তাদের কিয়দংশ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে (অর্থাৎ বক্র শির্ক পরিহার করে তওহীদের সরলতম মধ্যপথ অবলম্বন করে) এবং (কিয়দংশ আবার আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে বসে। এবং) যারা প্রবঞ্চক ও অকৃতজ্ঞ কেবল তারাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে (অর্থাৎ নৌকায় যে তওহীদের প্রতিজ্ঞা করেছিল তা ভংগ করে ফেলে এবং ভূ-ভাগে পৌঁছুতে পেরেছে বলে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল তাও ছেড়ে দেয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মহান আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী অসীম জ্ঞান ও অসাধারণ ক্ষমতার দৃশ্যাবলী অবলোকন করা সত্ত্বেও কাফির ও মুশরিকগণ স্বীয় শির্‌ক ও কুফরীতে অনড় রয়েছে বলে সূরার প্রারম্ভে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী ছিল। আর অপরপক্ষে স্বভাবসুলভ-অনুগত মু'মিনগণের প্রশংসা-স্তুতি ও শুভ পরিণতির বর্ণনা ছিল। মধ্যস্থলে মহামতি লোকমানের উপদেশাবলীও এক প্রকার সেসব বিষয়ের পরিপূরকই ছিল। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাকের সর্বব্যাপী ও সর্বতোমুখী জ্ঞান ও ক্ষমতা এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি তাঁর অজস্র কৃপা ও করুণারাজি বর্ণনা করে পুনরায় তওহীদের প্রতি আহবান করা হয়েছে।

سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ —অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের যাবতীয় বস্তু তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন—অনুগত করে দেয়ার অর্থ কোন বস্তুকে কারো আজ্ঞাবহ করে দেওয়া। প্রশ্ন হতে পারে যে, ভূ-মণ্ডলের সকল বস্তু তো আজ্ঞাবহ নয়। বরং অনেক বস্তুই তো মানুষের মর্জির বিপরীত কাজ করে। বিশেষ করে যেসব বস্তু নভোমণ্ডলে বিদ্যমান সেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ হওয়ার তো কোন সম্ভাবনাই নেই। উত্তর এই যে, تَسْخِيْر অর্থ কোন বস্তুকে কোন বিশেষ কাজে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োজিত করে রাখা। আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু মানুষের অনুগত করে দেওয়ার অর্থ এই যে, সেসব বস্তু মানুষের সেবা ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করে দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে অনেক বস্তু তো এমন যে, সেগুলোকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার সাথে সাথে তাদের আজ্ঞাবহও করে দেওয়া হয়েছে—তারা যখন যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করে। আবার কতক বস্তু এমনও আছে যেগুলো মানুষের কাজে তো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে—ফলে তা মানবসেবায় যথারীতি অবশ্যই নিয়োজিত—কিন্তু প্রতিপালকোচিত হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোকে মানুষের অনুগত করে দেওয়া হয়নি। যেমন নভোমণ্ডলে অবস্থিত সৃষ্টিজগৎ, গ্রহ-নক্ষত্র, বজ্র-বিদ্যুৎ, বৃষ্টিবাদল প্রভৃতি; যেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ করে দেওয়া হলে পর সেগুলোর উপর মানুষের স্বভাব, রুচি, প্রকৃতি ও অবস্থাবলীর বিভিন্নতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতো। একজন কামনা করতো যে, সূর্য অনতিবিলম্বে উদিত হোক। আবার অপরজন তার নিজস্ব প্রয়োজনে এর বিলম্বে উদয়নই কামনা করতো। একজন বৃষ্টি কামনা করতো; অপরজন উন্মুক্ত প্রান্তরে সফরে আছে বলে বৃষ্টি না হওয়াই কামনা করতো। এমতাবস্থায় এরূপ পরস্পর বিপরীতধর্মী চাহিদা আকাশমণ্ডলের বস্তুসমূহের কার্যক্রমে বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্যের উদ্ভব ঘটাতো। এজন্যই আল্লাহ্ পাক এসব বস্তু মানব সেবায় নিয়োজিত অবশ্যি রেখেছেন; কিন্তু তার আজ্ঞাবহ করে রাখেননি। এও এক প্রকারের করায়ত্তকরণই বটে।

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً অর্থ পরিপূর্ণ

করে দেওয়া। যার অর্থ আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য নিয়ামত বলতে সেসব নিয়ামতকেই বোঝায় যা মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে। যেমন মনোরম আকৃতি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অংগ এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরী করা যেন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ আকৃতি-প্রকৃতিতেও কোন প্রকারের বিকৃতি না ঘটায়। অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন-সম্পদ, জীবন-যাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কুশলাবস্থা----এ সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়ামত ও অনুকম্পাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ দীন ইসলামকে সহজ ও অনায়াসলব্ধ করে দেওয়া, আল্লাহ্-রসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের তওফীক প্রদান, অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা এবং শত্রুদের মোকাবেলায় মুসলমানদের প্রতি সাহায্য ও সহায়তা----এসবই প্রকাশ্য নিয়ামতসমূহের পর্যায়ভুক্ত। আর গোপনীয় নিয়ামত সেগুলো যা মানব হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত---যথা ঈমান, আল্লাহ্ পাকের পরিচয় লাভ এবং জ্ঞানবুদ্ধি, সচ্চরিত্র, পাপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ত্বরিত শাস্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি।

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ---এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাঁর ক্ষমতার ব্যবহার এবং তাঁর নিয়ামত (কৃপা ও দয়াসমূহ) যে একেবারে অসীম ও অফুরন্ত,---কোন ভাষার সাহায্যে তা প্রকাশ করা চলে না, কোন কলম দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করা চলে না, এ তথ্যটুকুই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি এরূপভাবে উদাহরণ পেশ করেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে যদি সেগুলোর সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরী করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি কালিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয় এবং এসব কলম আল্লাহ্ তা'আলার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গরিমা এবং তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করে তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে; তবু তাঁর অফুরন্ত প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি মাত্র সমুদ্র কেন---যদি অনুরূপ আরো সাত সমুদ্রও অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয় তবুও সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আল্লাহ্ পাকের মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। كلمات الله-এর ভাবার্থ আল্লাহ্ পাকের জ্ঞানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় বাক্যাবলী।----(রূহ ও মাযহারী) আল্লাহ্ পাকের মহিমা, কৃপা ও করুণাবলীও এর অন্তর্ভুক্ত। সাত সমুদ্র অর্থ এ নয় যে, সাত সমুদ্রের সংখ্যা সাতটিই; বরং এর অর্থ এই যে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্র সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয় তা সত্ত্বেও এগুলোর পানি দিয়ে আল্লাহ্র প্রজ্ঞাময় বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে সাতের সংখ্যা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে---সীমিত করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। যার প্রমাণ কোরআনের অন্য এক আয়াত---যেখানে বলা হয়েছে ঃ قُل لَّوْ كَانَ

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي

وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তনসূচক বাণীসমূহ প্রকাশ করতে যদি সমুদ্রকে কালিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্র শূন্য হয়ে যাবে---কিন্তু সে বাণীসমূহ শেষ হবে না। আর শুধু এ সমুদ্র নয়, অনুরূপ আরো সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত করলেও অবস্থা একই থাকবে। এ আয়াতে بِمِثْلِهِ বলে এরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি এ ধারা বহুদূর পর্যন্ত চলতে থাকে যে, এক সমুদ্রের সাথে অনুরূপ অপর সমুদ্র সংযুক্ত হয়ে তার সাথে অনুরূপ তৃতীয়টা, অনুরূপ চতুর্থটা----মোটকথা সমুদ্রসমূহের যতগুণ বা সংখ্যাই মেনে নেওয়া হোক না কেন-এগুলোর পানি কালি হলেও আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহ লিখে শেষ করতে পারবে না। যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে একথা সুস্পষ্ট যে, সমুদ্র সাতটি কেন, সাত হাজারও যদি হয় তবুও তা সীমাবদ্ধ, শেষ অবশ্যই হবে--কিন্তু كلمات الله অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাক্যাবলী অসীম ও অনন্ত---কোন সসীম বস্তু অসীমকে কিরূপে সীমিত করতে পারে?

কতক রেওয়ায়েতে আছে যে, এ আয়াত ইহুদী পাদ্রীদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাযিল হয়েছে। মহানবী হযরত (সা) যখন মদীনায় তশরীফ আনেন তখন কিছু সংখ্যক ইহুদী পাদ্রী হাযির হয়ে কোরআনের আয়াত وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (অর্থাৎ তোমাদেরকে অতি সামান্য পরিমাণ জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে) প্রসংগে আপত্তির সুরে বললো, আপনি (নবীজী) বলেন যে, তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। এতে আপনি কি শুধু আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, না আমাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন? মহানবী হযরত (সা) বললেন----আমার উদ্দেশ্য সকলেই। অর্থাৎ আমাদের জাতিও এবং ইহুদী-খৃস্টানগণও। তখন তারা আপত্তি করে বললো---আমাদেরকে তো আল্লাহ্‌ পাক তওরাত প্রদান করেছেন----যা تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ সকল বস্তুর (রহস্য) বর্ণনাকারী। তিনি বললেন, এও আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় অতি নগণ্য। আবার তওরাতে যেসব জ্ঞান রয়েছে সে সম্পর্কেও তোমরা পুরোপুরি অবহিত নও। কিন্তু আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় যাবতীয় আসমানী গ্রন্থ এবং সমস্ত নবীর সমষ্টিগত জ্ঞানও অতিশয় কিঞ্চিৎকর ও নগণ্য। এ বক্তব্যের সমর্থনেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ الاية ---(ইবনে-কাসীর)

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ
عَنْ وَّلَدِهٖ ۡ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ وَعْدَ
اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ
الْغَرُوْرُ ﴿٣٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ۭ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
غَدًا ۭ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿٣٤﴾

(৩৩) হে মানব জাতি ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। (৩৪) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর (এবং কুফরী ও শির্‌ক পরিহার কর) এবং সেদিনের ভয় কর যেদিন না কোন পিতা স্বীয় পুত্রের জন্য, না কোন পুত্র স্বীয় পিতার জন্য কোন দাবী আদায় করতে সক্ষম হবে। সেদিনের আগমন একেবারে অবশ্যম্ভাবী। কেননা এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের অঙ্গীকার রয়েছে। আর আল্লাহ্ পাকের অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে সত্য (প্রতিপন্ন) হয়। সুতরাং এ পার্থিব জীবন তোমাদেরকে যেন প্রতারিত না করে। (সুতরাং এর প্রবঞ্চনায় পড়ে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না বলে যেন মনে না কর। যেমন এরা বলে বেড়াতো وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْٓ اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى অর্থাৎ যদি আমাকে আমার পালনকর্তার সমীপে ফিরে যেতেও হয় তবে নিশ্চয় তাঁর নিকটেও আমার জন্য অতি চমৎকার আয়োজন থাকবে)। নিঃসন্দেহে কেবল আল্লাহ্ পাকই কিয়ামতের সংবাদ

রাখেন এবং তিনিই (স্বীয় জ্ঞানানুযায়ী বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সুতরাং এ সম্পর্কেও পূর্ণ জ্ঞান কেবল তাঁরই তরে নির্দিষ্ট।) এবং (গর্ভবতীর) গর্ভাশয়ে যা (পুত্র না কন্যা) রয়েছে তা কেবল তিনিই জানেন। এবং কোন ব্যক্তিই জানে না যে, আগামীকাল সে কি কাজ করবে। (এ সম্পর্কেও শুধু তিনিই জ্ঞাত) এবং কোন ব্যক্তি জানে না যে, তার মৃত্যু কোথায় হবে (এ সংবাদও শুধু তাঁর জ্ঞানেই রয়েছে। কেবল এগুলো কেন, যত অদৃশ্য বস্তু রয়েছে) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাকই সেসব কথা জানেন। (এবং এ-গুলো সম্পর্কে) পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত (এ ক্ষেত্রে অপর কারো অংশীদারিত্ব নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সমগ্র মানব-কুলকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা ও কিয়ামত দিবস সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে সেজন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ---অর্থাৎ হে মানবজাতি! স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় কর। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের মূল বা অন্য কোন গুণবাচক নামের স্থলে 'রব' (---পালনকর্তা) বিশেষ-ণটি চয়ন করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্কে ভয় করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা কোন হিংস্র জন্তু বা শত্রু সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে মনে যেরূপ ভয়ের উদ্রেক হয়ে থাকে সেরূপ ভয় নয়। কেননা আল্লাহ্ পাক তো তোমাদের পালনকর্তা---সুতরাং তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের কোন আশংকা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং এ স্থলে সে ধর-নের ভয় বোঝানো হয়েছে, যা বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনের প্রতি তাঁদের মানমর্যাদা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। যেমন পুত্র পিতাকে এবং ছাত্র তার শিক্ষককে ভয় করে। অথচ এঁরা তার শত্রু বা ক্ষতি সাধনকারী কেউ নয়। কিন্তু তাঁদের সম্ভ্রম ও প্রভাব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। তাই তাদেরকে পিতা ও ওস্তাদের অনুসরণে ও নির্দেশ পালনে বাধ্য করে। এ খানেও একথাই বোঝানো হয়েছে---যেন আল্লাহ্ পাকের মহান মর্যাদা ও প্রতাপ তোমাদের হৃদয়ে পুরোপুরি স্থান করে নেয়, যেন তোমরা অনায়াসে তাঁর অনুসরণ ও নির্দেশ পালন করতে পার।

وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ---অর্থাৎ সেদিনকে ভয় কর, যেদিন কোন পিতাও স্বীয় পুত্রের উপকার সাধন করতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোন পুত্রও স্বীয় পিতার কোন কল্যাণ সাধন করতে পারবে না।

এখানে ঐ শ্রেণীর পিতা-পুত্রকে বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে একজন মু'মিন অপরজন কাফির। কেননা, মু'মিন পিতা স্বীয় কাফির পুত্রের শাস্তি বিন্দুমাত্রও হ্রাস করতে পারবে না এবং তার কোন উপকারও সাধন করতে পারবে না। অনুরূপভাবে মু'মিন পুত্র কাফির পিতার কোন কাজে আসবে না।

এরূপ নির্দিষ্টকরণের কারণ, কোরআন করীমের অন্য আয়াতসমূহ এবং হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েত---যেখানে একথা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন পিতামাতা সন্তানের জন্য এবং সন্তান পিতামাতার জন্য সুপারিশ করবেন। আর এ সুপারিশ দ্বারা তারা লাভবান ও সফলকাম হবে। কোরআনে করীমে রয়েছে ঃ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে---আর তারাও মু'মিনে পরিণত হয়েছে ; আমি এ সন্তান-সন্ততিদেরকে তাদের পিতামাতার মর্যাদায় উন্নীত করে দেব। যদিও তাদের কার্যাবলী এ স্তরে পৌঁছার উপযোগী নয়। কিন্তু সৎ পিতামাতার কল্যাণে কিয়ামতের দিন তারা এ ফল লাভ করতে সক্ষম হবে যে, পিতামাতার স্তরে তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, সন্তানকে মু'মিন হতে হবে---যদিও কাজকর্মে কোন ত্রুটি ও শৈথিল্য থেকে থাকে।

অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে রয়েছে ঃ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ অর্থাৎ তারা অক্ষয় ও অবিনশ্বর স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে এবং এক্ষেত্রে তাদের যোগ্য হিসাবে প্রতিপন্ন পিতামাতা, স্ত্রীগণ ও পুত্র-পরিজনও তাদের সাথে প্রবেশ করবে। যোগ্য বলতে মু'মিন হওয়া বোঝানো হয়েছে।

এ আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি, অনুরূপভাবে স্বামী এবং স্ত্রী মু'মিন হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সমশ্রেণীভুক্ত হয় তবে হাশর ময়দানে একের দ্বারা অপরের উপকার সাধিত হবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসের রেওয়ায়েতে সন্তান কর্তৃক পিতামাতার জন্য সুপারিশ করার কথা বর্ণিত আছে। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিধি যে, হাশর ময়দানে কোন পিতা সন্তানের বা কোন সন্তান পিতার কোন উপকার সাধন করতে পারবে না---তা শুধু সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন এদের মধ্যে একজন মু'মিন এবং অপরজন কাফির হবে।----(মাযহারী)

ফায়েদা ঃ এখানে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে পিতা পুত্রের কোন উপকার সাধন করতে পারবে না---এ স্থলে ক্রিয়াবাচক বাক্যরূপে لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ---এই শব্দসমূহের ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দুটো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এক. একে বিশেষ্যবাচক বাক্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত. এখানে ولد শব্দের পরিবর্তে مولود শব্দ গৃহীত হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, তুলনা-মূলকভাবে ক্রিয়াবাচক বাক্যের চাইতে বিশেষ্যবাচক বাক্য অধিক জোরদার হয়ে থাকে। বাক্যের এরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে এ পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা পিতাপুত্রের মাঝে বিদ্যমান। তা এই যে, সন্তানের প্রতি পিতার ভালবাসা অধিকতর গভীর। পক্ষান্তরে পিতার জন্য সন্তানের ভালবাসা দুনিয়াতেও সে স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। আর এখানে হাশর ময়দানে উপকার সাধনে উভয়ের অক্ষমতার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সন্তানের কোন উপকার সাধন না করার কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে। আর ولد শব্দের স্থলে مولود শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, مولود বলতে শুধু সন্তানগণকেই বোঝানো হয় আর ولد শব্দ অধিকতর ব্যাপক। ---সন্তানগণের সন্তানগণও এর অন্তর্ভুক্ত। এতে অপরদিক দিয়ে এ বিষয়েরও সমর্থন পাওয়া গেল যে, স্বয়ং ঔরসজাত পুত্রও পিতার কোন কাজে আসবে না। তাহলে পৌত্র ও প্রপৌত্রের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অপর আয়াতে পাঁচটি বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ পাকেরই জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং অপর কোন সৃষ্টির সে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমেই সূরায়ে লোকমান শেষ করা হয়েছে।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ

অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ পাকেরই রয়েছে (অর্থাৎ কোন্ বছর কোন্ তারিখে সংঘটিত হবে) এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন (অর্থাৎ কন্যা না পুত্র ; কোন্ আকৃতি-প্রকৃতির) এবং আগামী কাল কি অর্জন করবে তা কোন ব্যক্তি জানে না (অর্থাৎ ভাল মন্দ কি লাভ করবে) অথবা কোন্ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে তাও কেউ জানে না।

প্রথম তিন বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান যদিও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর জ্ঞান নেই। কিন্তু বাক্য বিন্যাস ও প্রকাশভংগী থেকে

একথাই বোঝা যায় যে, এসব বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ পাকের অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারেই সীমিত রয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট বস্তুদ্বয় সম্পর্কে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর তথ্য ও তত্ত্ব জানা নেই। এ পাঁচ বস্তুকে সূরায়ে আন'আমের আয়াতে مفاتح الغيب অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ

—অর্থাৎ কেবল আল্লাহ্ পাকের নিকটই অদৃশ্য জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি, তিনি ভিন্ন অন্য কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। হাদীসে একে مفاتح الغيب বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে ঃ مفتاح - مفاتيح-ও-مفاتح —এর বহুবচন, যার অর্থ তালা খোলার চাবি। সুতরাং এর অর্থ অদৃশ্য জ্ঞান ভাণ্ডারের মূল—যার সাহায্যে অদৃশ্য জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়।

অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত মাস'আলা ঃ এ মাস'আলার প্রয়োজনীয় বর্ণনা সূরায়ে নামলের আয়াত قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রদান করা হয়েছে। এ আয়াতে যাবতীয় অদৃশ্য জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ পাকেরই জন্য নির্দিষ্ট বলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে; এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোটা উম্মতের আকীদা-বিশ্বাসও এই। আলোচ্য আয়াতে যে পাঁচ বস্তু উল্লেখ করে এর জ্ঞান কোন সৃষ্টির নেই, কেবল আল্লাহ্ পাকেরই রয়েছে বলে যা বলা হয়েছে তা শুধু এ কয়টিকেই নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়। অন্যথায় সূরায়ে নামলের আয়াতের সহিত বৈপরীত্য দেখা দেবে। বরং এ পাঁচ বস্তুর বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশার্থে সেগুলো এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিশেষীকরণ ও গুরুত্ব আরোপের কারণ এই যে, সাধারণত যেসব অদৃশ্য বস্তুর তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে মানুষ আগ্রহান্বিত—তা এ পাঁচ বস্তুই। এ ছাড়া অদৃশ্য জ্ঞানের দাবীদার জ্যোতিষিগণ যেসব বস্তুর তথ্য মানুষের নিকটে প্রকাশ করে নিজেদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে প্রমাণ করতে চায়—তাও এ পাঁচ বস্তুই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, জনৈক ব্যক্তি মহানবী হযরত (সা)-কে এ পাঁচ বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে এ পাঁচ বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ পাকের রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইবনে উমর (রা) ও ইবনে মসউদ (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে ইরশাদ হয়েছে اُوتيت مفاتح كل شئ الا الخمس (امام احمد ابن كثير) —অর্থাৎ পাঁচটি ব্যতীয় যাবতীয় বস্তুর চাবি আমাকে প্রদান করা হয়েছে—এতে اُوتيت স্বয়ং একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, এ পাঁচ বস্তু ব্যতীত যে সব অদৃশ্য জ্ঞান নবীজির অর্জিত ছিল তা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছিল। সুতরাং

তা অদৃশ্য জ্ঞানের সংজ্ঞাভুক্ত নয়। কেননা নবীগণকে (সা) ওহী এবং ওলীগণকে ইলহামের মাধ্যমে যে অদৃশ্য তথ্যাবলী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবগত করানো হয় তা প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্য জ্ঞানই নয়—যার উপর ভিত্তি করে তাদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলা যেতে পারে। বরং সেগুলো أَنْبَاءُ الْغَيْبِ —অর্থাৎ অদৃশ্য বার্তা আল্লাহ্ পাক যখন চান এবং যতটুকু চান ফেরেশতাকুলকে, নবীগণকে এবং তাঁর মনোনীত সিদ্ধ পুরুষগণকে প্রদান করেন। কোরআন করীমে এগুলোকে أَنْبَاءُ الْغَيْبِ —অদৃশ্যবার্তাসমূহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে—বলা হয়েছে ঃ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ —অর্থাৎ (এগুলো) অদৃশ্য তথ্যাবলী, যা ওহীর মাধ্যমে আমি আপনাকে অবহিত করেছি।

সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ এই যে, এ পাঁচ বস্তুকে তো আল্লাহ্ পাক নিজ সত্তার সাথে এমনভাবে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন যে, أنباء الغيب—অদৃশ্য বার্তা হিসেবেও ফেরেশতা বা নবীগণকে এ জ্ঞান প্রদান করা হয়নি। এগুলো ছাড়া অন্যান্য অদৃশ্য জ্ঞানের অনেক কিছু নবীগণকে ওহীর মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

এ বক্তব্য থেকেও এ পাঁচ বস্তু বিশেষভাবে উল্লেখের আরও এক কারণ জানা গেল।

আরও একটি সন্দেহ ও তার উত্তর ঃ উল্লিখিত আয়াতে একথা প্রমাণিত হলো যে, সাধারণ অদৃশ্য জ্ঞান যা আল্লাহ্ পাকের বৈশিষ্ট্য তন্মধ্যে বিশেষ করে উক্ত পাঁচ বস্তু এমন যে, যার জ্ঞান কোন নবী (সা)-কে ওহীর মাধ্যমেও প্রদান করা হয় না। সুতরাং এসব বস্তু সম্পর্কে কারো কিছু জানার কথা নয়। অথচ আল্লাহ্ পাকের ওলীগণ সম্পর্কে এমন অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তারা বৃষ্টি বর্ষণের আগাম সংবাদ দিয়েছেন বা কোন গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছেন বা কারো সম্পর্কে কোন কাজ করা বা না করার অগ্রিম সংবাদ দিয়েছেন, কারো মৃত্যুস্থান নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন এবং তাঁদের এসব আগাম বার্তা বাস্তবে ঠিক প্রমাণিতও হয়েছে।

অনুরূপভাবে কোন কোন গণক ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ এসব বস্তু সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য প্রদান করে থাকে এবং কখনো কখনো তা ঠিকও হয়ে যায়। তবে এ পাঁচ বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই সংগে কিভাবে নির্দিষ্ট রইলো?

এর এক উত্তর তো উহাই যা 'সূরায়ে নামলে' সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্তভাবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে অদৃশ্য জ্ঞান (ইল্‌মে গায়েব) তাকেই বলা হয়, যা কোন প্রচলিত ও স্বাভাবিক কারণের মাধ্যমে হয় না;

বরং কোন মাধ্যম ছাড়া নিজে নিজেই হয়। এসব জ্ঞান যদি নবীগণ (সা)-এর ওহীর মাধ্যমে, ওলীগণের ইলহামের মাধ্যমে এবং গণক ও জ্যোতিষিগণের নিজস্ব গণনা বা অন্য কোন স্বাভাবিক কারণের মাধ্যমে অর্জিত হয় তবে তা ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান নয় বরং অদৃশ্য বার্তা (أنباء الغيب)—যা আংশিকভাবে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো অর্জিত হয়ে যাওয়া উল্লেখিত আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সমগ্র সৃষ্টি ও যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কিত এ পাঁচ বস্তুর পরিপূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ্ পাক কাউকে ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে প্রদান করেন নি। ইলহামের মাধ্যমে কোন এক-আধটা ঘটনা প্রসংগে আংশিক জ্ঞানলাভ, এর পরিপন্থী নয়।

ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ঃ বরেণ্য ওস্তাদ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র) তাঁর তফসীরের সংশ্লিষ্ট টীকায় এক সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যবহ তথ্য প্রকাশ করেছেন। যদ্দ্বারা উল্লিখিত সব ধরনের প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়। তা এই যে, গায়েব দু'প্রকারের। (এক) অদৃশ্য নির্দেশাবলী, যথা শরীয়তের নির্দেশাবলী, আল্লাহ্ পাকের যাত ও সিফত, সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞানও এর অন্তর্গত, যাকে ইলমে আকায়েদ বলা হয়। আর শরীয়তের সেসব নির্দেশা যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের কোন কোন্ কাজ পছন্দ-নীয়, কোন্গুলো অপছন্দনীয়, তা জানা যায়—এসব বস্তু গায়েব বা অদৃশ্যই বটে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ —اكوان غيبية (অদৃশ্য ঘটনাবলী) অর্থাৎ ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলী সংশ্লিষ্ট জ্ঞান। প্রথম শ্রেণীভুক্ত অদৃশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞান হক তা'আলা নবী ও রসূলগণ (স)-কে প্রদান করেছেন, যার উল্লেখ কোরআনে করীমে এরূপভাবে রয়েছে ঃ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ—অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ও পছন্দনীয় রসূল ব্যতীত অন্য কেহ তাঁর গোপনীয় ও অদৃশ্য তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ اكوان غيبية (ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলী) —এর পূর্ণ জ্ঞান তো হক তা'আলা কাউকে প্রদান করেন না—তা সম্পূর্ণভাবে সেই মহান সত্তার সাথে নির্দিষ্ট। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঘটনার আংশিক জ্ঞান যখন এবং যতটুকু চান প্রদান করেন। এরূপভাবে মূল অদৃশ্য জ্ঞান তো পুরোপুরিই আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট। অনন্তর তিনি নিজ অদৃশ্য ও গোপনীয় জ্ঞান হতে অদৃশ্য নির্দেশাবলীর জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে নবীগণ (সা)-কে তো স্বাভাবিকভাবেই অবহিত করেন। তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশ্যও এটাই। اكوان غيب (ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর) আংশিক জ্ঞানও যতটুকু আল্লাহ্ পাক চান নবী ও ওলীগণকে ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে প্রদান করেন। যা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বলে একে ইল্মে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান বলা চলে না—বরং গোপন বার্তা (أنباء الغيب) বলা হয়।

আয়াতের শব্দাবলী সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ঃ এ আয়াতে পাঁচ বস্তুর জ্ঞান হক তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট থাকার কথা বিশেষ গুরুত্বসহ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং পাঁচ বস্তুকে একই শিরোনামভুক্ত করে এগুলোর জ্ঞান মহান আল্লাহ্‌রই জন্য নির্দিষ্ট করে অন্য কোন সৃষ্টির এ জ্ঞান নেই—এ কথা বলে দেওয়াই বাহ্যত বাঞ্ছনীয় ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু উল্লিখিত আয়াতে এমনটি করা হয়নি। বরং প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান তো ইতিবাচকভাবে আল্লাহ্ পাকের জন্যই নির্দিষ্ট থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে ও অপর দু'বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো কোন জ্ঞান নেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার প্রথম তিন বস্তুর মধ্য হতে কিয়ামতের বর্ণনা এরূপভাবে করা হয়েছে ঃ—إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ অর্থাৎ কিয়ামতের তথ্য কেবল আল্লাহ্ পাকেরই জানা রয়েছে। দ্বিতীয় বস্তুর বর্ণনা শিরোনাম পাল্‌টিয়ে ক্রিয়াবাচক বাক্যে এরূপভাবে করা হয়েছে ঃ—وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এখানে বৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের কোন উল্লেখই নেই বরং এখানে অবতরণ করার উল্লেখ রয়েছে। তৃতীয় বস্তুর বর্ণনা আবার শিরোনাম পাল্‌টিয়ে এরূপভাবে করা হয়েছে ঃ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ শিরোনামের এরূপ পরিবর্তন বাক্য বিন্যাসের এক প্রকার রীতিও বলা যেতে পারে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আরো কিছু অভিনব তত্ত্ব ও তাৎপর্য পরিলক্ষিত হবে, যা হযরত থানবী (র) 'বয়ানুল কোরআনে' বর্ণনা করেছেন। এর সংক্ষিপ্তসার এই যে, শেষোক্ত দু'বস্তু অর্থাৎ আগামীকাল মানুষ কি উপার্জন করবে এবং সে কোন্ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে যা মানুষের নিজ সত্তা-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার, মানুষের এগুলোর জ্ঞান অর্জন করার সম্ভাবনা হয়তো থাকতে পারতো। এ সম্ভাবনা অপনোদনের উদ্দেশ্যে এ দুয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কোন জ্ঞান নেই বলে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদ্দ্বারা প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান ও তথ্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো না থাকার কথা অতি উত্তমভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কেননা যখন মানুষ নিজ কার্যাবলী ও উপার্জনাদি এবং নিজ পরিণতি অর্থাৎ মৃত্যু ও মৃত্যুস্থল সম্পর্কে কিছু জানে না, তখন আকাশ, বৃষ্টি বর্ষণ ও মাতৃগর্ভের গভীর অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন ভ্রূণ সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে কি? সর্বশেষ বস্তুতে কেবল মৃত্যুস্থল সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। অথচ মৃত্যুস্থলের ন্যায় মৃত্যুক্ষণও মানুষের জানা নেই। কারণ এই যে, মৃত্যুস্থল নির্দিষ্টভাবে জানা না থাকলে বাহ্যিক অবস্থাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ এ সম্পর্কে কিছুটা অনুধাবন করতে পারে যে, সে যেখানে বসবাস করছে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে। অন্তত যে স্থানে মারা যাবে সে স্থানটি দুনিয়াতে তো বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে মৃত্যুক্ষণ যা অনাগত ভবিষ্যৎকাল; এখনো অস্তিত্ব

পর্যন্ত লাভ করেনি। সুতরাং যে ব্যক্তি মৃত্যুস্থান কার্যত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা জানে না, তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা কিভাবে করা যেতে পারে যে, মৃত্যুক্ষণ যার এখনো অস্তিত্বও নেই তা সে জেনে নিতে সক্ষম হবে।

মোটকথা এখানে এক বস্তুর নিষেধের সাথে সাথে অপর বস্তুসমূহের নিষেধও অতি উত্তমভাবে বোধগম্য হয়ে যায়। তাই এ দু'বস্তুকে নেতিবাচক শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত তিন বস্তু প্রকাশ্যতই মানুষের নাগালের বাইরে বলে তাতে মানুষের জ্ঞানের কোন অধিকার না থাকাটাই সুস্পষ্ট। এ জন্য এক্ষেত্রে হাঁ-সূচক শিরোনাম অবলম্বন করে সেগুলো হক তা'আলারই জন্য নির্দিষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে প্রথম বাক্য বিশেষ্যবাচক ও পরবর্তী দু'বাক্য ক্রিয়াবাচক বাক্য-রূপে ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবত এ প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, কিয়ামত তো এক সুনির্দিষ্ট বিষয়---এতে কোন নতুনত্ব নেই। পক্ষান্তরে সন্তান ধারণ ও বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টা ঠিক এমনটি নয়---এতে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব আরোপিত হতে থাকে। কিন্তু ক্রিয়াবাচক বাক্য নতুনত্ব প্রকাশ করে। এজন্যই ইহাকে উভয় স্থানেই ব্যবহার করা হয়েছে। আবার এ দুয়ের মধ্যেও হামলের (সন্তান ধারণ) ক্ষেত্রে তো আল্লাহ্ পাকের ইলমের উল্লেখ রয়েছেঃ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ (অর্থাৎ মাতৃগর্ভে কি রয়েছে তা তিনিই জানেন) এবং বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে ইলমের উল্লেখ নেই। এর কারণ এই যে, এখানে বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ করে আনুষঙ্গিকভাবে এও ব্যক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, বৃষ্টির সাথে মানবজাতির অগণিত কল্যাণ ও উপকার বিজড়িত, তা মহান আল্লাহ্ কর্তৃকই বর্ষিত হয়। এতে অন্য কারো কোন কর্তৃত্ব বা ভূমিকা নেই। অতএব এ সম্পর্কিত জ্ঞান বাক্যের বর্ণনাভংগী থেকেই প্রমাণিত হয়।

سورة السجدة

সূরা সাজদাহ

মক্কায় অবতীর্ণ, ৩ রুকূ, ৩০ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ اَمْ
يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ
مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার নামে আরম্ভ।

(১) আলিফ-লাম-মীম, (২) এ কিতাবের অবতরণ বিশ্বপালনকর্তার নিকট থেকে এতে কোন সন্দেহ নেই। (৩) তারা কি বলে, এটা সে মিথ্যা রচনা করেছে? বরং এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। সম্ভবত এরা সুপথ প্রাপ্ত হবে।

তফসীরের সার সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-মীম (যার অর্থ আল্লাহ্ পাকই জানেন)। এটা অবতরিত গ্রন্থ (এবং) এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। (এবং) এটা বিশ্বজগতের পালনকর্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। (যেমন এ গ্রন্থের অলৌকিকত্ব ও অনন্যতার প্রমাণ এ গ্রন্থ স্বয়ং। অবিশ্বাসী) লোকেরা কি এরূপ কথা বলে যে, এ গ্রন্থ পয়গম্বর (সা)-এর স্বকপোল কল্পিত রচনা (অর্থাৎ এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক ও মিথ্যা—ইহা মানব রচিত নয়) বরং ইহা আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে (আগত) সম্পূর্ণ সত্য গ্রন্থ ----যেন আপনি (এর মাধ্যমে) সেসব লোকদের (আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শন করেন যাদের নিকটে আপনার পূর্বে কোন ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেন নি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ এখানে نَذِير ---ভয়প্রদর্শক বলে রসূলকে বোঝানো হয়েছে। যার মর্ম এই যে, মহানবী হযরত (সা)-এর পূর্বে মক্কার কুরায়শগণের নিকট কোন নবী আগমন করেন নি। কিন্তু এ দ্বারা এ কথা বোঝায় না যে, এ পর্যন্ত নবীগণের দাওয়াতও তাদের নিকট পৌঁছেনি। কেননা, কোরআন করীমের অপর এক আয়াতে স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে যে, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ — অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যার মাঝে আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে কোন ভয়প্রদর্শক এবং তাঁর পক্ষ থেকে কোন দাওয়াত প্রদানকারীর আগমন হয়নি।

এ আয়াতে نَذِير—শব্দটি সাধারণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের প্রতি আহবানকারী, চাই তিনি রসূল ও পয়গম্বর হোন বা তাদের কোন প্রতিনিধি বা ধর্মীয় আলিম হোন। এ আয়াত দ্বারা সকল সম্প্রদায় ও দল-সমূহের নিকটে তওহীদের দাওয়াত পৌঁছে গেছে বলে বোঝা যায়। একথা স্বস্থানে সম্পূর্ণ ঠিক এবং আল্লাহ্ পাকের সর্বব্যাপী করুণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন ইমাম আবূ হাইয়্যান বলেন যে, তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত কোন কালে, কোন স্থানে এবং কোন সম্প্রদায়ে কখনো ছিন্ন ও ক্ষুন্ন হয়নি। যখনি এক নবুয়তের উপর দীর্ঘ-কাল অতিবাহিত হওয়ার পর সেই নবুয়ত ভিত্তিক জ্ঞানের অধিকারী আলিমগণ নিতান্ত নগণ্য সংখ্যক হয়ে পড়তেন, তখনি অপর নবী বা রসূল প্রেরিত হতেন। এ দ্বারা এ কথা বোঝা যায় যে, আরব সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও সম্ভবত তওহীদের দাওয়াত পূর্ব থেকেই অবশ্য পেঁৗছেছিল। কিন্তু এজন্য এটা আবশ্যক নয় যে, এ দাওয়াত স্বয়ং কোন নবী বা রসূল বহন করে এনেছিলেন---হতে পারে তাঁদের প্রতিনিধি আলিম-গণের মাধ্যমে পৌঁছেছিল; সুতরাং এ সূরা এবং সূরায়ে ইয়াসিন ও অন্যান্য সূরার যেসব আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আরবের কুরায়শ গোত্রে তাঁর পূর্বে কোন نذير (ভয়প্রদর্শক) আগমন করেন নি, তখন نذير বলতে এর পারিভাষিক তথ্যানুযায়ী নবী-রসূলকেই বোঝাবে এবং অর্থ এই হবে যে, এ সম্প্রদায়ে অপনার পূর্বে কোন রসূল বা নবী আগমন করেন নি। যদিও অন্যান্য উপায়ে তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত এখানেও পেঁৗছেছিল।

রসূলুল্লাহ্ (স)-র প্রেরণের পূর্বে বহু ব্যক্তি সম্পর্কে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর দীনের (জীবন বিধান) উপর অবস্থিত ছিলেন। তওহীদের (একত্ববাদ) প্রতি তাদের ঈমান ছিল। প্রতিমা পূজা করতে ও প্রতিমার নামে কোরবানী করতে তাঁরা ঘৃণা প্রকাশ করতেন।

রাহুল মা'আনীতে মূসা বিন ওক্‌বা হতে এ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, ওমর বিন নুফায়েল যিনি মহানবী হযরত (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর সাথে সাক্ষাতও করেছিলেন। কিন্তু নবুয়ত লাভের পূর্বে তাঁর ইন্তেকাল ঐ সালে হয়, যে সালে কুরায়শগণ বায়তুল্লাহ্ পুনঃ নির্মাণ করেন এবং এটা তাঁর নবুয়ত লাভের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা।—মূসা বিন ওকবাহ তাঁর সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কুরায়শদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে বিরত রাখতেন এবং প্রতিমার নামে কোরবানী করাকে গর্হিত ও অশোভন বলে মন্তব্য করতেন। তিনি পৌত্তলিকদের জবাইকৃত জন্তুর গোশত খেতেন না।

আবূ দাউদ তায়ালেসী উমর বিন নুফায়েল-তনয় হযরত সায়ীদ বিন উমর (রা) হতে (যিনি আশারায়ে-মুবাশশারাহভুক্ত সাহাবী ছিলেন) এ রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি নবীজির খেদমতে আরয করেছিলেন, আমার পিতার অবস্থা আপনি জানেন যে তিনি তওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—প্রতিমা পূজার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে পারি কি? রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান যে হ্যাঁ, তাঁর মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা জায়েয। তিনি কিয়ামতের দিন এক স্বতন্ত্র উম্মতরূপে উঠবেন।—(রাহুল)

অনুরূপভাবে ওরাকা বিন নাওফেল যিনি হুযূর (সা)-র নবুয়ত প্রাপ্তির প্রারম্ভিক স্তরে এবং কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা পর্বে বর্তমান ছিলেন—তিনি তওহীদের উপরই বিশ্বাস রাখতেন এবং রসূলুল্লাহ্কে (সা) দীন প্রচারে সাহায্য করতে সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি পরলোকগমন করেন। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, আরব জাতিসমূহ আল্লাহ্র তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত থেকে তো বঞ্চিত ছিলেন না। কিন্তু তাদের মাঝে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি। আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। এ তিন আয়াত—কোরআন যে সত্য এবং রসূলুল্লাহ্ যে প্রকৃত নবী তা প্রমাণ করে।

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا
شَفِیْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَی
الْاَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ اِلَیْهِ فِیْ یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ
مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۝

الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ
طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝ ثُمَّ سَوّٰىهُ
وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ
قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

(৪) আল্লাহ্, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না? (৫) তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতপর তা তাঁর কাছে পৌঁছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। (৬) তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, (৭) যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। (৮) অতপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। (৯) অতপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ্ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনিই আল্লাহ্—যিনি ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং উভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর (রাজ সিংহাসন সদৃশ) আরশের উপর (যেরূপ তাঁর মান ও মহান মর্যাদা উপযোগী সেরূপভাবে) সুপ্রতিষ্ঠিত (ও বিকশিত) হয়েছেন। (তিনি এমন মহান যে তাঁর সম্মতি ও অনুমোদন) ব্যতীত কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না। (অবশ্য তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশ কার্যকর হতে পারে কিন্তু সাহায্যের সাথে অনুমতি সংশ্লিষ্ট থাকবে না) সুতরাং তোমরা কি অনুধাবন কর না (যে এমন মহান সত্তার কোন শরীক হতে পারে না) তিনি (এমন যে) আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত (যত কিছু আছে) সব কিছুর পরিকল্পনা (ও ব্যবস্থাপনা) তিনিই করেন। অতপর প্রত্যেক বস্তু তাঁর সমীপে এমন একদিন পৌঁছে যাবে, তোমাদের গণনানুসারে যার পরিমাণ এক হাজার বছরের সমান হবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যাবতীয় বস্তু এবং তৎসংশ্লিষ্ট সব কিছু তাঁর সমীপে উপস্থিত হবে—যেমন আল্লাহ্ পাক ফরমান—وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ অর্থাৎ, তাঁর সমীপেই সব কিছু

ফিরে যাবে।) তিনিই অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বস্তুর (তথ্যাদি) সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত,—মহা পরাক্রান্ত ও পরম করুণাময়। তিনি যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু অত্যন্ত নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন (অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে সেগুলো সৃষ্টি করেছেন সম্পূর্ণভাবে তার উপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন) এবং মানব [অর্থাৎ হযরত আদম (আ)] সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি দিয়ে। তৎপর তুচ্ছ পানির সারাংশ —(অর্থাৎ বীর্য) থেকে মানবের (অর্থাৎ আদম (আ)-এর বংশধর সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর (মাতৃগর্ভে) তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুসংগঠিত করেছেন এবং তন্মধ্যে নিজ (পক্ষ) থেকে আত্মা ফুৎকার করে দিয়েছেন। এবং (ভূমিষ্ট হওয়ার পর) তোমাদেরকে কান, চোখ ও অন্তঃকরণসমূহ (অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ অনুধাবন যন্ত্র) প্রদান করেছেন—(এবং তাঁর অসীম ক্ষমতা ও কৃপা নির্দেশক এসব বস্তুসমূহের স্বাভাবিক দাবি এটাই, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর—যার সর্বোচ্চ রূপ হলো তওহীদ কিন্তু) তোমরা অত্যল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক (অর্থাৎ মোটেও কর না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ ঃ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর এবং সূরায়ে 'মা'আরিজের আয়াতে রয়েছে ঃ— فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ

অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে।

এর এক সহজ উত্তর তো এই—যা 'বয়ানুল-কোরআনে' উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেদিনটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে বলে মানুষের নিকট অতিশয় দীর্ঘ মনে হবে। এরূপ দীর্ঘানুভূতি নিজ নিজ ঈমান ও আমলানুপাতে হবে। যারা বড় অপরাধী তাদের নিকট দীর্ঘ এবং যারা কম অপরাধী তাদের নিকট কম দীর্ঘ বলে বোধ হবে। এমনকি সেদিন কতক লোকের নিকট এক হাজার বছর বলে মনে হবে আবার সেদিনটি অন্যদের নিকট পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে।

তফসীরে রূহুল মা'আনীতে ওলামা ও সূফীগণ কর্তৃক উক্ত আয়াতের আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তা সবই কাল্পনিক ও অনুমান প্রসূত। কোনটাই কোরআনের মর্মভিত্তিক বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং সলফে সালেহীন—সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নিরাপদ—তা হলো, তাঁরা পঞ্চাশ ও একের এ পার্থক্য আল্লাহ্ পাকের জ্ঞান ও অবগতির উপরই ছেড়ে দিয়েছেন এবং এ তত্ত্ব তাঁদের জানা নেই, একথা বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ هما يومان ذكرهما الله تعالى فى كتابه الله تعالى اعلم بهما واكره ان اقول فى كتاب